এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

আলো

অষ্টদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য-সম্মেলন
৭-৮ই মে, ২০২২
নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চ
মৌলালী যুবকেন্দ্র
কলকাতা

বিশেষ সংখ্যা

পত্রিকা উপসমিতি

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ,
বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী শুভ্রান্ত ঘটক, তৃষিত সেনগুপ্ত

সম্পাদক
অম্লান দে

সূচীপত্র

			পৃ.
১.	আমাদের কথা		৩
২.	অষ্টাদশ রাজ্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটি		৪
৩.	সম্মেলন-পরিক্রমা		৬
৪.	সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায়	দেবব্রত ঘোষ	১৭
৫.	নজরদারি 'রাষ্ট্র' ও 'মিডিয়া'	কৃশানু দেব	২৩
৬.	পরিবেশ ও রাজনীতি	অম্লান দে	৩০
৭.	সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ	বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী	৩৫
৮.	জন্মশতবর্ষে আলোয় সোমনাথ হোর	প্রণব দত্ত	৪০

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

১. **দেবব্রত ঘোষ** ....সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

২. **কৃশানু দেব** .... সাধারণ সম্পাদক, এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

৩. **অম্লান দে** .... সমিতির মুখপত্র 'আলো'-র সম্পাদক

৪. **বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী** .... সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

৫. **প্রণব দত্ত** .... সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

ঐতিহাসিক 'তে-ভাগা' আন্দোলনের ৭৫ বর্ষ পূর্ত্তি ও বরেণ্য শিল্পী **সোমনাথ হোর** (১৯২১-২০০৬)-এর জন্মশতবর্ষপূর্ত্তিকে স্মরণ করে এই বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে মুদ্রিত হল শিল্পীর কালজয়ী তেভাগা-চিত্রমালার একটি অসামান্য 'উডকাট'। জন্মশতবর্ষপুর্ত্তির স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে কালচেতনার শিল্পী সোমনাথ হোরের জীবন ও শিল্পকৃতিকে নিয়ে একটি লেখাও স্থান পেয়েছে এই বিশেষ সংখ্যায়।

আমাদের কথা

১৯৮৭ সালের ২৩শে মে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আমাদের প্রিয় সমিতি 'এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল'; প্রায় চার দশকের গৌরবোজ্জ্বল পথ-পরিক্রমায় নীতি ও আদর্শের অবিচল থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ক্যাডারস্বার্থরক্ষায় বরাবর 'চ্যাম্পিয়ন'-এর ভূমিকা পালন করে এসেছি আমরা, ক্যাডারদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে ক্রমাগত পথ হেঁটেছি সামনের দিকে। বিভেদ ও প্ররোচনার কানাগলিতে রাস্তা না হারিয়ে সুবিধাবাদ ও হঠকারিতার চোরাবালি এড়িয়ে দৃঢ়পণ মানসিকতায় আমরা পেরিয়ে এসেছি অনেক বিঘ্নসংকুল পথ। চলার বেগে পায়ের তলায় ক্রমশঃ জেগে উঠছে নতুন নতুন রাস্তা। পূর্বসূরীদের শ্রম ও আত্মত্যাগ সংগঠনের যে মজবুত ভিত গড়ে দিয়েছিল, নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব সেখানে দাঁড়িয়েই ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলনের পতাকাকে উড্ডীন রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার সূত্রেও একের পর এক নানান কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে সাংগঠনিক উদ্যোগে।

সংগঠনের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় পরবর্তী কার্যক্রমও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ মঞ্চ 'রাজ্য-সম্মেলন'; সমিতির প্রয়াত নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত মঞ্চে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে গত ৭-৮ই মে, ২০২২-এ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে সমিতির অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য-সম্মেলন। এই উপলক্ষ্যে সমিতির মুখপত্র 'আলো'-র এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে 'সম্মেলন-স্মরণিকা' রূপে।

বাংলার নবজাগরণের ভগীরথ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের আড়াইশ বছর, বিশিষ্ট শিল্পী সোমনাথ হোরের জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি, সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষকে স্মরণ করে এবং এই সময়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গে পাঁচটি বিভিন্ন লেখায় সজ্জিত করা হয়েছে 'আলো-র এই বিশেষ সংখ্যাটিকে।

এই 'স্মরণিকা' প্রকাশের সূত্রে অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য-সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যে সমস্ত সুধীজন ও শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের হার্দ্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সমস্ত সহযোদ্ধাবন্ধুদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

অন্ধকারের দ্বার ছিন্ন করে আলোর পথযাত্রীদের অবিরাম যাত্রার চির-সঙ্ঘর্ষ বিভান্বিত করুক আগামী দিনের পথচলাকে।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন

৭-৮ই মে, ২০২২

নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধায় মঞ্চ

মৌলালি যুবকেন্দ্র

কলকাতা

অভ্যর্থনা কমিটি

সভাপতি : শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী : সুমিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন পাত্র, সুরজ রাউথ, রাজা বাগ, অমিত চৌধুরী, সৌমেন্দ্র বেরা, সুভাষ দেবনাথ, তথাগত মুখার্জী, সৌম্য দাস

কার্যকরী সভাপতি : অমৃত ঘোষ, দেবপ্রসদা মুখার্জী

সহ-সভাপতি : রাজর্ষি পাল, শুভজিৎ সান্যাল, বিশ্বরূপ ঘোষ, কৌশিক চ্যাটার্জী

কার্যকরী সম্পাদকদ্বয় : অমলেশ ঘোষ, সইদ হাসান সিমন

যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় : শুভদীপ চ্যাটার্জী, সৌরভকান্তি বেরা

দপ্তর সম্পাদক : কৃশানু সেন

কোষাধ্যক্ষ : আদিত্য মজুমদার

উপসমিতি

দপ্তর : কৃশানু সেন (আহ্বায়ক), প্রণব সাঁতরা, দ্বৈপায়ন ঘোষ

অর্থ : আদিত্য মজুমদার (আহ্বায়ক), সৌমেন্দু ধাড়া, রূপাঙ্ক দাম

খাদ্য : মানব সরকার (আহ্বায়ক), উৎপল বিশ্বাস, সবুজ চ্যাটার্জী

আবাসন : রাধাবিলাস মণ্ডল, শুভদীপ সরকার

উপসমিতি

মঞ্চ ও প্রচার : নিউটন রায়, অঞ্জনা ভট্টাচার্য

পরিবহণ : ধনঞ্জয় বিশ্বাস, জয়দীপ মল্লিক, ভরত মাইতি

স্বাস্থ্য : অভিজিৎ বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল

মহিলা : জয়ন্তী চক্রবর্তী, জাবিন বারি, সায়ন্তী মণ্ডল

সাংস্কৃতিক : আমিনুল ইসলাম খান, দীপান্বিতা পাল, শতাব্দী সরকার

স্বেচ্ছাসেবক : কমলেশ গায়েন, সৌমেন্দ্রনাথ পাল, সুরেশ প্রামাণিক, দিবাকর বিশ্বাস, অশোক মাহাতো, কুতুবুদ্দিন মণ্ডল, সৌজিৎ সাহা, নীলাঞ্জনা সিন্‌হা, বিশ্বজিৎ হালদার

সম্মেলন পরিক্রমা

প্রথম রাজ্য সম্মেলনঃ ৯-১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলকাতা।
উদ্বোধকঃ রমনীকান্ত দেবশর্মা, বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
প্রধান অতিথিঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি---অসিতবরণ দাস, সহঃ সভাপতি---দীপক সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক—সুকুমার দে, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—অরবিন্দ মন্ডল, সহ-কোষাধ্যক্ষ—পরেশ পাল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক—ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র, দপ্তর সম্পাদক—রাধাচরণ লাহা।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) অজিত মন্ডল—কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগনা (উত্তর) ও ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)।
২) সুভাষ কোঙার—বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া।
৩) অসিত সামন্ত—মালদা, পঃ দিনাজপুর, বীরভুম, মুর্শিদাবাদ।
৪) গণেশ রায়—দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি।

দ্বিতীয় (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ টাউনহল, বর্ধমান।
উদ্বোধক ঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।
প্রধান অতিথি ঃ শুভাশীষ গুপ্ত, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক।
বিশেষ অতিথি ঃ সমর বাওড়া, সম্পাদক, সারাভারত কৃষকসভা, বর্ধমান জেলাকমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, রাধাচরণ লাহা, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম সম্পাদক—নিমাই মুখার্জী, সহ-সম্পাদক—অরবিন্দ মন্ডল, সুব্রত ব্যানার্জী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—সুকুমার দে, সহঃ কোষাধ্যক্ষঃ—পরেশ পাল, পত্রিকা সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) সুভাষ কোঙার—বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক, পুরুলিয়া ২। অরিন্দম বক্সী—মালদা,পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ৩। এরশাদ আলী—কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগনা (উত্তর) ও (দক্ষিণ)

৩য় (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ বহরমপুর কমার্স কলেজ, মুর্শিদাবাদ।

উদ্বোধকঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথিঃ জয়নাল আবেদিন, কৃষক আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতৃত্ব ও সাংসদ এবং জোহাক আলি, সম্পাদক, সারাভারত কৃষকসভা, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী
ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সম্পাদক—অরবিন্দ মন্ডল, সুব্রত ব্যানার্জী, কোষাধ্যক্ষ—সুকুমার দে, সহ-কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, সদস্য—মোশারফ হোসেন, বিমল পাল চৌধুরী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অরিন্দম বক্সী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) অরিন্দম বক্সী—হুগলী, হাওড়া, তমলুক ২। এরশাদ আলী—উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, নদীয়া ৩। সুভাষ কোঙার—মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ৪। দেবেন মাহাতো—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ৫। সুব্রত চক্রবর্তী—মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, ৬। গণেশ রায়—দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি।

৪র্থ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, অডিও ভিস্যুয়াল হল, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী
ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সম্পাদক—সুব্রত ব্যানার্জী, মোশারফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব রক্ষক—বিমল পাল চৌধুরী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, সদস্যগণ—অরিন্দম বক্সী, মৃণাল চক্রবর্তী, সম্পাদকমন্ডলীর স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যগণ—সুকুমার দে, অরবিন্দ মন্ডল, দেবেন মাহাতো, পার্থ মুখার্জী, সুভাষ সামন্ত।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) গণেশ রায়—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চল ২। সুব্রত চক্রবর্তী—উঃ দিনাজপুর, দঃ দিনাজপুর মালদা অঞ্চল ৩। দেবেন মাহাতো—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক অঞ্চল। ৪। আব্দুল আরিফ—বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ৫। পার্থ মুখার্জী—হাওড়া, হুগলী, নদীয়া অঞ্চল ৬। সুভাষ সামন্ত—কলকাতা, উঃ ২৪ পরগণা, দঃ ২৪ পরগণা অঞ্চল।

৫ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ৯-১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ কমঃ অম্লান সেন মঞ্চ (বিদ্যাসাগর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়) মেদিনীপুর।

উদ্বোধক ঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ বিনয় চৌধুরী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—মোশারফ হোসেন, সহ-সম্পাদক—সুব্রত ব্যানার্জী ও মৃণাল চক্রবর্তী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব পরীক্ষক—বিমল পাল চৌধুরী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—সুভাষ শিকারী, অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—দেবেন মাহাতো, সুভাষ সামন্ত, পার্থ মুখার্জী, অরবিন্দ মন্ডল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সুভাষ সামন্ত—কলকাতা—দক্ষিণ ২৪ পরগণা—উত্তর ২৪ পরগণা ২। পার্থ মুখার্জী—হাওড়া-হুগলী-নদীয়া ৩। দেবেন মাহাতো—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ ৫। গণেশ রায়—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৬। সুনীল বর্মণ—দার্জীলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৬ষ্ঠ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ৫-৭ই জুলাই, ১৯৯৮, কমরেড নীরেন চৌধুরী মঞ্চ, রবীন্দ্রভবন, চুঁচুড়া হুগলী।

উদ্বোধক ঃ স্মরজিৎ রায়চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ ডাঃ সুর্যকান্ত মিশ্র, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—পরেশ পাল, সুব্রত ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, সৌমেন চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, দপ্তর সম্পাদক—প্রবীর ঘোষ, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, হিসাব রক্ষক—প্রণব দত্ত, সদস্যগণ—সুভাষ শিকারী, মৃণাল চক্রবর্তী, প্রবীর ব্যানার্জীও অর্ণব সাহা, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদসগ্যণ—দীপক সেনগুপ্ত, মোশারফ হোসেন, বিমল পালচৌধুরী, পার্থসারথি মুখার্জী, অলোক গুপ্ত।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অলোক গুপ্ত—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা ২। পার্থ মুখার্জী-হাওড়া-হুগলী-নদীয়া ৩। দেবেন মাহাতো—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর, ৪। রবিউল ইসলাম—বর্ধমান-বীরভুম-মুর্শিদাবাদ, ৫। কাদের

হোসেন—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর, ৬। সুনীল বর্মণ—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৭ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ১৩-১৫ই আগস্ট, ২০০০ সিউড়ি ডি.আর.ডি.এ. হল, বীরভূম

উদ্বোধকঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, অসীম ব্যানার্জী, সাদারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ-সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, অর্ণব সাহা, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব রক্ষক—অসিত কুমার দাস, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, সদস্য—বিশ্বজিৎ বসু, সমীরণ রায়চৌধুরী, পরিচয় ভট্টাচার্য, ইরশাদ আলি। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—দীপক সেনগুপ্ত, পার্থসারথী মুখার্জী, অলোকগুপ্ত, সমীরকুমার বসু, প্রণব দত্ত, মৃণাল চক্রবর্তী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অলোক গুপ্ত—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-উত্তর ২৪ পরগনা ২। সমীর বসু-হাওড়া-হুগলী-নদীয়া, ৩। দেবেন মাহাতো-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর ৪। রবিউল ইসলাম-বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ ৫। কাদের হোসেন—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৮ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১০-১১ই মে,২০০২ রবীন্দ্রভবন (অমল বিকাশ দত্ত মঞ্চ) কোচবিহার।

উদ্বোধক ঃ জ্যোতিপ্রাসাদ বসু, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া, পর্যটন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, দেবেন মাহাতো, অসীম ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, অর্ণব সাহা, কোষাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, দপ্তর সম্পাদক—অসিত কুমার দাস, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—অশোক কুমার দেবনাথ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—পরিচয় ভট্টাচার্য, ঈর্শাদ আলি, বিশ্বজিৎ বসু, সমীরণ রায়চৌধুরী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, অলোক গুপ্ত, সোমনাথ ব্যানার্জী, পার্থসারথী মুখার্জী

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। মৃণাল চক্রবর্তী—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-হাওড়া-হুগলী। ২। ধনঞ্জয় বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩ কার্তিক ঘোষাল-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া। ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। মহম্মদ আলাউদ্দিন—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। সুভাষ বেরা—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। নিতাই সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

৯ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৩-২৫ শে জানুয়ারী, ২০০৪ সরশুনা কলেজ, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি , সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, সহ-সভাপতি—অসীম ব্যানার্জী, যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সমীর বসু, সাধারণ সম্পাদক—অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদক—অরিন্দম বক্‌সী, সহ-সম্পাদক—অর্ণব সাহা, বিশ্বজিৎ বসু, দপ্তর সম্পাদক—অসিত কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—বিমলেন্দ্রনাথ মহলানবীশ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—পরিচয় ভট্টাচার্য, সমীরণ রায়চৌধুরী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, শান্তা দত্ত, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, অলোক গুপ্ত, সোমনাথ ব্যানার্জী, নিমাইপ্রসাদ মুখার্জী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। হরিমোহন ব্যানার্জী—কলকাতা-হাওড়া-হুগলী-দঃ ২৪ পরগনা। ২। ধনঞ্জয় বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। নিখিলসুন্দর চক্রবর্তী—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। অশোক দেবনাথ—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। নিতাই সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর

১০ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ১০-১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ **কম্‌ সোমনাথ বন্দ্যোপাধায় মঞ্চ,** শরৎ সদন, হাওড়া।

উদ্বোধক ঃ জ্যোতিপ্রসাদ বসু, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অশোক চক্রবর্তী, সহযোগী সম্পাদক, 'সংগ্রামী হাতিয়ার' ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক---অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়---অরিন্দম বক্‌সী, বিশ্বজিৎ বসু,

সহ-সম্পাদকদ্বয়---অসিত কুমার দাস ও পরিচয় ভট্টাচার্য, দপ্তর সম্পাদক---চঞ্চল সমাজদার, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—সুমিতরঞ্জন মুখার্জী, সম্পাদকমমন্ডলীর সদস্য—শান্তা দত্ত, দিব্যসুন্দর ঘোষ, শোভন চক্রবর্তী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অলোক গুপ্ত, নিমাইপ্রসাদ মুখার্জী ঈর্শান আলি, তপন মণ্ডল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সমীর ভট্টাচার্য—কলকাতা-হাওড়া-হুগলী-দঃ ২৪ পরগণা। ২। বাসুদেব রায়—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। সমীরণ রায়চৌধুরী—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। মহম্মদ আলাউদ্দিন—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। তাপসরঞ্জন মিত্র—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর

একাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২২-২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, টাউনহল, মালদা

উদ্বোধক ঃ অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ জ্যোতিপ্রসাদ বসু, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক---অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়---অরিন্দম বক্সী, বিশ্বজিৎ বসু, সহ-সম্পাদক—অসিত কুমার দাস ও দিব্যসুন্দর ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, হিসাব রক্ষক—ওয়াহিদ আনোয়ার খান, দপ্তর সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য—শ্রীমতী শান্তা দত্ত, তপন মন্ডল, অর্ণব সাহা, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অলোক কুমার গুপ্ত, ঈর্শাদ আলি, পরিচয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর গাঙ্গুলী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সুনীত ব্যানার্জী—কলকাতা-দার্জিলিং-কোচবিহার। ২। সৌমেন ঘোষ—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৩। সুদীপ্ত ভট্টাচার্য—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সঞ্চিত ব্যানার্জী—বর্ধমান-বীরভূম ৫। কার্তিক ঘোষাল---বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। প্রভাস বিশ্বাস---নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা ৭। বাসুদেব রায়—কলকাতা-হুগলী-হাওড়া-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ৮। অসিত সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

দ্বাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৩-১৫ই মার্চ, ২০১০, রবীন্দ্রভবন, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ সমীর ভট্টাচার্য, যুগ্ম আহ্বায়ক, ১২ই জুলাই কমিটি এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ প্রবীর মুখার্জী, সহকারী সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, সহ-সভাপতি—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, অজিত কুমার দত্ত, অসিত কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, যুগ্ম-সম্পাদক—বিশ্বজিৎ বসু, প্রণব দত্ত, সহ-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, চঞ্চল সমাজদার, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, হিসাবরক্ষক—তপন মন্ডল, দপ্তরসম্পাদক—দীপঙ্কর গাঙ্গুলী, পত্রিকা সম্পাদক—অলোক গুপ্ত, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য—ওয়াহিদ আনোয়ার খান, আশিস গুপ্ত, সোমা গাঙ্গুলী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, ঈর্শাদ আলি, জরিতা দাস, আবদুল্লা জামাল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। স্বপন পাত্র—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। সৌমেন ঘোষ—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। সুব্রত চক্রবর্তী—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সঞ্জিত ব্যানার্জী—বর্ধমান-বীরভূম ৫। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। ৬। প্রভাত বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা ৭। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৮। বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৯। অভিজিৎ ভূঁইঞা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

ত্রয়োদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৪-২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১২, মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলিকাতা।
উদ্বোধক ঃ ডঃ প্রভাত দত্ত, শতবার্ষিকী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—অজিত দত্ত, সহ-সভাপতি—অশোক দেবনাথ, দীপঙ্কর গাঙ্গুলী, জরিতা দাস, সাধারণ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, যুগ্ম-সম্পাদক—বিশ্বজিৎ বসু, প্রণব দত্ত, সহ-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, শুভাশীষ মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ—মহঃ কালামউদ্দিন, হিসাব রক্ষক—আশিস গুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, দপ্তর সম্পাদক—কৃশানু দেব, সদস্য—সোমা গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর মন্ডল, অম্লান দে, স্থায়ী আমন্ত্রিত—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, মনোরঞ্জন চেধুরী, দেবদাস ভট্টাচার্য, শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, পুষ্পেন্দু সাহা।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অয়ন চ্যাটার্জী—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। মদন মন্ডল—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিন দিনাজপুর ৩। বিশ্বজিৎ মাইতি—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। দেবব্রত সাউ—বর্ধমান-বীরভূম ৫। অসিত দাস—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। রবীন্দ্রনাথ জানা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৭। বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৮। সমীরণ রায়চৌধুরী—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৯। অসীম সাহা—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

চর্তুদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৫-১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪, জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম হল, জলপাইগুড়ি।

উদ্বোধক ঃ **ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী,** অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপতি—শ্রী প্রণব দত্ত, সহ সভাপতি—শ্রী অসিত দাস, শ্রীমতী জরিতা দাস, শ্রী সমর তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক—শ্রী চঞ্চল সমাজদার যুগ্ম সম্পাদক—শ্রী দিব্যসুন্দর ঘোষ, শ্রী শুভাশীষ মজুমদার, সহ সম্পাদক—শ্রী আশিস কুমার গুপ্ত, শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ—শ্রী গৌতম সাঁতরা, হিসাব রক্ষক—শ্রী অম্লান দে, দপ্তর সম্পাদক—শ্রী বিশ্বজিত মাইতি, পত্রিকা সম্পাদক—শ্রী কৃশানু দেব, সদস্য—শ্রী অরিন্দম বক্সী, আব্দুল্লা জামাল, শ্রী সুদীপ সরকার, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রী অজিত দত্ত, শ্রীমতী সোমা গাঙ্গুলী, শ্রী রূপবিলাস মন্ডল, শ্রী শুভাশীষ চক্রবর্তী।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। শ্রী নীলোৎপল চক্রবর্তী—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। শ্রী মদন মন্ডল—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। শ্রী সঞ্জয় মুখার্জী—মালদা-মুর্শিদাবাদ। ৪। শ্রী সুশান্ত কুণ্ডু—বর্ধমান-বীরভূম ৫। শ্রী প্রিয়ব্রত রাঢ়ী—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। শ্রী পুষ্পেন্দু সাহা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৭। শ্রী বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৮। শ্রী নিরঞ্জন গায়েন—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগনা ৯। শ্রী শিলাদিত্য ভট্টাচার্য্য—কলকাতা -দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

পঞ্চদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৬-১৭ই জানুয়ারী, ২০১৬, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।

উদ্বোধক ঃ **অধ্যাপক সুবিমল সেন।**

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

সভাপতি—প্রণব দত্ত, **সহ-সভাপতি**—অসিত কুমার দাস, কৌশিক ভট্টাচার্য, সোমা গাঙ্গুলী, **সাধারণ সম্পাদক**—চঞ্চল সমাজদার, **যুগ্ম-সম্পাদক**—দিব্যসুন্দর ঘোষ, শুভাশিস মজুমদার, **সহ-সম্পাদক**—আশিস গুপ্ত, সুদীপ সরকার, **দপ্তর-সম্পাদক**---বিশ্বজিৎ মাইতি, **পত্রিকা-সম্পাদক**---অম্লান দে, **কোষাধ্যক্ষ**—গৌতমকুমার সাঁতরা, **হিসাবরক্ষক**—শৈবাল মিত্র, **সদস্য**—অরিন্দম বক্সী, আব্দুল্লা জামাল, সুশান্ত কুণ্ডু, কৃশানু দেব, পুষ্পেন্দু সাহা, শুভ্রাংশু বসু; **স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য**—মনোরঞ্জন চৌধুরী, অজিত দত্ত, বাসুদেব রায়, শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, প্রণবেশ পুরকাইত, শান্তনু গাঙ্গুলী।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। শ্রী নীলোৎপল চক্রবর্তী—কোচবিহার-দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার ২। রাহুল ব্রহ্ম—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। শুভাশিস চক্রবর্তী—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সুমন ঘোষ—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৫। কৌশিক সামন্ত—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। দেবব্রত সাউ—বীরভূম-বর্ধমান ৭। রজত চক্রবর্তী—হুগলী-হাওড়া ৮। বাসুদেব সরকার—উত্তর ২৪ পরগণা-নদীয়া ৯। নিরঞ্জন গায়েন—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন ঃ ২০-২১শে জানুয়ারি ২০১৮, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।
উদ্বোধক: **নন্দিনী মুখার্জী**, অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও অন্যান্য সদস্য
কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—প্রণব দত্ত, সহ-সভাপতি—সোমা গাঙ্গুলি গৌতম সাঁতরা, শৈবাল মিত্র, সাধারণ সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, যুগ্ম-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, বিশ্বজিৎ মাইতি, সহ-সম্পাদক—আশিস গুপ্ত, শান্তনু গাঙ্গুলী, দপ্তর সম্পাদক—কৃশাণু দেব, পত্রিকা সম্পাদক—অম্লান দে, কোষাধ্যক্ষ— আবদুল্লা জামাল, হিসাবরক্ষক—অদিতি সর্বজ্ঞ, সদস্য—অরিন্দম বকসী, শুভাশীষ মজুমদার, গৌতম সর্দার, সুশান্ত কুণ্ডু, শুভ্রাংশু বসু, প্রণবেশ পুরকাইত, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অজিত দত্ত, অসিত দাস, বাসুদেব রায়, অনিমেষ ঘোষ, সুদীপ সরকার, মহঃ সইদ হাসান সিমন।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ২। উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর—সুভাষ মোহান্ত, ৩। মালদা-মুর্শিদাবাদ—অসীম কুমার দাস, ৪। পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম—শঙ্কর নস্কর, ৫। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া—সুদীপ সোরেন, ৬। বীরভূম-বর্ধমান—কৌশিক পাত্র, ৭। হুগলী-হাওড়া—সুদেষ্ণা রায়, ৮। উত্তর ২৪ পরগণা-নদীয়া—শিবপ্রসাদ দাস, ৯। কলিকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা—নিরঞ্জন গায়েন।

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১১-১২ই জানুয়ারি, ২০২০, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি।
উদ্বোধক ঃ **রজত বন্দ্যোপাধ্যায়,** প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী
ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দিব্যসুন্দর ঘোষ, **সহ-সভাপতি**—গৌতমকুমার সাঁতরা, সোমা গাঙ্গুলী, দেবব্রত ঘোষ, **সাধারণ সম্পাদক**—চঞ্চল সমাজদার, **যুগ্ম-সম্পাদক**—আশিসকুমার গুপ্ত ও কৃশানু দেব, **সহকারী সম্পাদক**—শান্তনু গাঙ্গুলী ও শুভ্রাংশু বসু, **কোষাধ্যক্ষ**—আব্দুল্লা জামাল, **দপ্তর-সম্পাদক**—সুশান্ত কুণ্ডু, **হিসাবরক্ষক**—রিম্পা সাহা, **পত্রিকা-সম্পাদক**—অম্লান দে, **সদস্যবৃন্দ**—অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত, বিশ্বজিৎ মাইতি, অনিমেষ ঘোষ, মহঃ সঈদ হাসান, গৌতম সর্দার, **স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য**—বাসুদেব রায়, সুদীপ সরকার, প্রণবেশ পুরকাইত, সৌগত বিশ্বাস, দেবাংশু সরকার, শিবপ্রসাদ দাস।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি-আলিদুপদুয়ার-কোচবিহার—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার; মালদা ও মুর্শিদাবাদ—শুভব্রত মিত্র, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম—কৌশিক পাত্র, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া—তারক

হালদার, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম—কৌশিক সামন্ত, হাওড়া ও হুগলী—বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা—শুভ্রান্ত ঘটক, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা—কৃশানু সেন।

অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ৭-৮ই মে, ২০২২, নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চ, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।

উদ্বোধকঃ **সব্যসাচী চক্রবর্তী**, বিশিষ্ট শিল্পী; বিশেষ অতিথিঃ **ড. অরুণাভ মিশ্র**, অধ্যাপক ও লেখক।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দিব্যসুন্দর ঘোষ, **সহ-সভাপতি**—সুশান্ত কুণ্ডু, সোমা গাঙ্গুলী, দেবব্রত ঘোষ, **সাধারণ সম্পাদক**—কৃশানু দেব, **যুগ্ম-সম্পাদক**—শান্তনু গাঙ্গুল, সুদীপ সরকার, **সহ-সম্পাদক**—মহঃ সঈদ হাসান সিমন, রিম্পা সাহা, **কোষাধ্যক্ষ**—আবদুল্লা জামাল, **দপ্তর সম্পাদক**—অনিমেষ ঘোষ, **পত্রিকা সম্পাদক**—অম্লান দে, **হিসাবরক্ষক**—ঋদ্ধি চক্রবর্তী, **সদস্য**—চঞ্চল সমাজদার, আশীষ কুমার গুপ্ত, বিশ্বজিৎ মাইতি, শুভ্রাংশু বসু, দেবাংশু সরকার, তারিকুল ইসলাম, সৌগত বিশ্বাস, শিবপ্রসাদ দাস, **স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য**—প্রণবেশ পুরকাইত, গৌতম সর্দার, প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার—**শ্যাম কুমার দেওয়ান**, উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর—**মনোতোষ অধিকারী**, মালদা-মুর্শিদাবাদ—**স্বরূপ দত্ত**, বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমান-পূর্ব বর্ধমান—**শ্রীকান্ত দে**, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া—**তারক হালদার**, ঝাড়গ্রাম-পশ্চিম মেদিনীপুর-পূর্ব মেদিনীপুর—**কৌশিক সামন্ত**, হাওড়া-হুগলী—**বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী**, নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা—**শুভ্রান্ত ঘটক**, কোলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা—**দেবপ্রসাদ মুখার্জী**।

With Best
Compliments from :

R.C.G. FILLING STATION

(Indian Oil Petrol Pump)

DEALER : *Smt. Rita Ghorai*

KURMIPATHRA, BALIGERIA
NAYAGRAM, JHARGRAM
PH : 8637561616

JHM-6

সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রামমোহন রায়

দেবব্রত ঘোষ

"Rammohan Roy was a truely great man, a man who did a truely great work, and whose name, if it is right to prophesy, will be remembered for ever as one of the great benefactors of mankind. The German name for Prince is Furst, in english first, he who always to the fore, he who courts the place of danger, the first place in fight, the last in fight. Such a furst was Rammohan Roy, a true Prince, real Rajah, if Rajah also like Rex means originally the Statesman, the man at the Helm."

—Max Muller

ভারতের বর্তমান যুগের অলৌকিক (miraculous) ও অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) বস্তুতে বিশ্বাস এতো বেড়েছে যে লোকে যখনই কোন আশ্চর্যবস্তু দেখে, তখনই সেটি তাঁদের পৌরাণিক যুগের বীরগণের কিংবা বর্তমানের সাধু সন্ন্যাসীদের ওপর আরোপ করে, এবং তার সুস্পষ্ট কারণ বর্তমান থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তার কারণ তো যাদের সুস্থ মন ও যারা ন্যায় অনুরাগী তাঁদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইউরোপের লোকদের অনেক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, বাজীকরের হাত সাফাই ও নৈপুণ্য প্রভৃতি এমন অনেক জিনিস আছে, যার কারণ দৃশ্যত যেন অজ্ঞাত এবং মানববোধ শক্তির বহির্ভূতবলেই মনে হয়; কিন্তু বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাজাত তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলেই এই আপাত-গুহ্য কারণগুলি বেশ সন্তোষজনক ভাবেই জানা যায়। এই সন্ধান পেলে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় বিশ্বাসীদের দ্বারা বুদ্ধিমান লোকেরা আর প্রতারিত হবেন না। তবে এ বিষয়ে আমরা বড় জোর এই বলতে পারি যে, কোন কোন ব্যাপারে, তীক্ষ্ণ গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও অনেক আশ্চর্য ঘটনার কারণটা লোকেরঅজ্ঞাত থেকেই যায়। সে সব ক্ষেত্রে আমাদের সুযুক্তির উপর নির্ভর করা উচিত; এবং নিজেকে এই প্রশ্নই করা উচিত যে এর কারণটার জন্য আমাদের বোঝবার বর্তমান অক্ষমতাই আসলেদায়ী, না, প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত অসম্ভব কোন মাধ্যমের উপর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত। শত শত বছর আগে কোন মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, বা কেউ স্বর্গারোহণ করেছে ইত্যাদি অসম্ভব ও অযৌক্তিক ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধান করবার এমন কি দরকার পড়ে?

এইরকম একটা দোলাচলে থাকা সামাজিক অবস্থানের মধ্যে থেকেও 'ভারত পথিক' রামমোহন ধর্ম বা ধর্মগুলোকে অস্বীকার না করেও শুধুমাত্র ভারত নয় গোটা পৃথিবীর জন্য লিখলেন 'মানাজারু তুল্ আদিয়ান' নামক নিবন্ধ। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'নানা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা'। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ (সেই ভাষাতেই) অনুসন্ধান করে এবং প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গে ধর্মের সাথে তার দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করে ঐ বিখ্যাত গ্রন্থ তিনটির প্রথম একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার টানলেন। হাফেজ, কোরাণ, বাইবেল, রামায়ণ, জেন্দ আবেস্তা, ত্রিপিটক সব জায়গা থেকেই তিনি এনে হাজির করলেন একটাই শিক্ষা—'বিশ্বমানবকে শান্তি দাও!' উপনীত হলেন উপসংহারে:—

" 'ধর্মগুরু', 'সেখের' বহু ভণ্ডামীপূর্ণ কাজের কোন মূল্যই নেই।লোকের অন্তরে শান্তি দাও, ইহাই একমাত্র

পারমার্থিক উপদেশ”।

মানবজাতির সাধারণ লোককে তিনি ভাগ করলেন চার শ্রেণীতে—

এক. এক শ্রেণির লোককে প্রতারক বলা যায়, যারা লোককে তাদের দলে টানবার জন্য ইচ্ছেমতো নানা মতবাদ, ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করে, লোককে কষ্ট দেয় ও তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

দুই. আর এক শ্রেণির লোককে প্রতারিত বলা যায়, যারা কোন সত্য খবর না জেনেই অন্যের দলে যোগ দেয়।

তিন. এক শ্রেণির লোক—যারা প্রতারক এবং প্রতারিত। তারা অন্যের উক্তিকে বিশ্বাস করে এবং অপরকেও তা আঁকড়ে ধরতে প্ররোচিত করে।

চার. যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রতারক নয়, প্রতারিতও নয়। ‘কারো অনিষ্টের চেষ্টা করোনা, আর যা খুশী তাই করো। কারণ অন্যের অনিষ্টকরা ভিন্ন আমাদের কাছে আর কোনও পাপ নেই’—হাফেজ

আজ ২০২২ সালের শেষের দিকে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনলে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের লেখা কোনও নিবন্ধ পড়ছি বলেই মনে হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু একসময় এই উপসংহারই ছিল বৈপ্লবিক যা ‘ভারত পথিক’-এর উত্তরসূরী হিসেবে আজও আমাদের গর্বিত করে, উৎসাহিত করে, দায়িত্ব বোধে উন্নীত করে ‘এ পৃথিবীটাকে শিশুর বাসযোগ্য করার’ লড়াইয়ে সামান্যতম সক্রিয় ভূমিকা নিতে।

আমাদের বর্তমান বিষয় অবশ্য ‘ভারত পথিক’-এর এহেন উপলব্ধিটাকে প্রতিফলিত করা নয়, এমনকী ভারত গৌরব ‘ভারত পথিকে’র যে সমস্ত সামাজিক সংস্কার ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করছে সেগুলোকে পুনর্বার স্মরণ করা নয় বরং বলা যেতে পারে যে দেশের এই যে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যাদের মধ্যে আবার নিরক্ষর শিক্ষিত অংশ, সাক্ষর অর্দ্ধশিক্ষিত অংশ, নারীদের সমাজে অসম অবস্থা—সামগ্রিকভাবে এই ভিন্নতার মধ্যেও আধুনিক ভারত তৈরীর যে বাসনা এবং সেই বাসনা চরিতার্থ করতে সামগ্রিক সামাজিক শিক্ষায় সকলকে শিক্ষিত করতে হবে এই ভাবনায় তখন মশগুল আমাদের ‘ভারত পথিক’। সমাজের সমগ্র অংশের মানুষকে বিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার বাস্তবতা তখনও তৈরী নেই। খুব অল্প সংখ্যক কিছু তৈরী করা যায় তাও আবার বিদেশীদের সহযোগিতায়। আছে সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানের ভিন্নতা। ভাবতে দেরী করেননি দেশের প্রথম আধুনিক মানুষটি। ইউরোপ যে কায়দায় এগোচ্ছে ভারতকে সেই একই পথে এগাতে হবে সামাজিক শিক্ষায় তার জনগণকেকে শিক্ষিত করতে। দেশে এই ভাবনার পথিকৃৎ ‘ভারত পথিক’ স্বয়ং। হিসেব করে দেখলেন একমাত্র সংবাদপত্রই খুব সহজে এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ। নিরপেক্ষ-নির্ভীক সংবাদ পত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে শুরু করলেন এক নতুন যুগের। নিজেই নামলেন আসরে; ‘ভারত পথিক’-এর বহু সামাজিক কাজও লড়াই বহু চর্চিত কিন্তু এই বিষয়টা খানিক আড়ালেই থেকে গেছে বরাবর। সেদিকটাতেই সম্ভবমতো আলোকপাত করার জন্যই এই নিবন্ধ তৈরীর প্রয়াস।

‘His political views wer far in advance of the age and his conception of international brotherhood, though it had little effect in the 19th century, may be said to have inspired even the great Rabindranath in the present century. To Sum up: Rammohan Roy did not create the new age, but he was one of the greatest representative of that age and reflected in himself many distinguished features in himself many distinguished features that heralded Ranaissance in Bengal.’

—Ramesh Ch. Mazumder

গুরুদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় যে কালে বিরাজ করেন সে কাল যেমন

অতীতে তেমনি অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারিনি। মধ্যযুগীয় ভারতকে তিনি হঠাৎ আধুনিক যুগের দ্বারদেশে এনে উপস্থাপিত করলেন, বহু বছরের সঞ্চিত জড়ত্বের যবনিকা অপসারিত করে মুক্তিসুর্যের আলোকে চতুর্দিকে প্রদীপ্ত করে তুললেন এবং অচলায়তনের অবরুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে বহির্বিশ্বের অবাধ হাওয়া তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তাঁর অমরচিন্তা ও মননের সাক্ষ্য বহন করে তার সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলো।

সাংবাদিকতায় রামমোহনের ভূমিকা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকায়। ১৮২৩। সাংবাদিকতায় ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার মেয়াদ তখন পাঁচ বছর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও ব্রিটিশ। পাশ্চাত্য সভ্যতা আর স্থানীয় প্রাচ্য সভ্যতার আঁচলে জড়ানো ধর্মীয় কুসংস্কারের মিশ্রণ। টানাপোড়েন-অনাচার-অসহিষ্ণুতা- উচ্ছৃঙ্খলতা। একদিকে যখন নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্ররূপ অন্যদিকে তখন ‘নেটিভ’দের কাছে জানার ও শেখার এক বিরাট উন্মুক্ত অঙ্গন ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যেই উঠে এলো এক পরিবর্তনের আবহাওয়া; যা পরবর্তীকালে বাংলার তথা দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশের দ্যোতক। ১৭৮০। হিকির বেঙ্গল গেজেট যখন প্রকাশিত হচ্ছে, রামমোহন রায়ের বয়স তখন আট বছর। ১৮১৪। হুগলী জেলা থেকে রামমোহন রায় পাকপাকি ভাবে চলে আসেন কলকাতায়। তখন তার বয়স বত্রিশ। ১৭৮০ থেকে ১৮১৪ এই সময়কালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে মোট এগারোটি সংবাদপত্র। যদিও তার সবই ছিল ইংরেজ মালিকাধীন এবং ইংরাজী ভাষায়। দৈনিক পত্রিকা একটিও তখন ছিল না। ছিল সাতটি মাসিক এবং চারটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮১৮। সালটি বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই বছরেই ভারতীয়দের পরিচালনা-সম্পাদনায় এবং খাঁটি ভারতীয় ভাষায় প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ‘বেঙ্গল গেজেট’ (সাপ্তাহিক) প্রকাশনার মধ্য দিয়ে (প্রকাশকাল নিয়ে মতভেদ আছে)। এই ‘বেঙ্গল গেজেট’ প্রকাশের আগেই রামমোহনের বন্ধু জেমস সিল্ক বাকিংহামের সম্পাদনায় ‘ক্যালকাটা জার্নাল’ ভারতবর্ষ তথা বাংলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আছে, ১৮১৮ সালেই লর্ড হেস্টিংস ভারতে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ‘মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন’ যা পূর্বে চালু ছিল তা প্রত্যাহার করে নেন। হেস্টিংসের উদারনীতির পূর্ণ সুযোগের সদব্যবহার করতে যে গুটিকয়েক বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসেছিলেন, রামমোহন রায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

হিন্দুধর্মের প্রতি অযৌক্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশকরলেন ইংরাজীতে Brahmanical Magazine এক পৃষ্ঠায় আর অন্য পৃষ্ঠায় বাংলায় ‘ব্রাহ্মণ সেবধী’। ইংরাজীতে মূল রচনা, বাংলায় তাঁর নিজেরই অনুবাদ। হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারী দ্বারা প্রকাশিত ‘সমাচার দর্পণ’-এর এক বিতর্কিত ও আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছিলেন। ‘সমাচার দর্পণ’-এর সম্পাদক প্রথম অংশ ছাপতে রাজী হলেও, দ্বিতীয় অংশ না ছাপানোর প্রতিবাদে তিনি পত্রিকাটি প্রকাশ করলেন। সংবাদপত্র প্রথম থেকেই ছিল তাঁর কাছে প্রতিবাদের মাধ্যম। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কারমূলক রচনা ‘সতী’ প্রকাশের জন্য ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত ‘বেঙ্গল গেজেট’-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এর কারণ হতে পারে যে ‘আত্মীয় সভার’ অন্যতম সদস্য হরচন্দ্র রায় ছিলেন তখন ‘বেঙ্গল গেজেট’-এর সম্পাদক এবং এই পত্রিকাটি তখন কলকাতার সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। রামমোহনের স্বাধীন চেতনা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র ‘সম্বাদ কৌমুদী’ প্রকাতি হয় ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর। সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক ছিলেন

তারাচাঁদ দত্ত। রামমোহন রায় ছিলেন এই পত্রিকার মূলশক্তি। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার-বিরুদ্ধ মতের তথা প্রগতিশীল মনোভাবের পৃষ্ঠপোষক রামোহন রায়ের লেখা 'কৌমুদী'র অন্যতম বিষয় হয়ে উঠল। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বেঙ্গল গেজেট'-এর পর 'সম্বাদ কৌমুদী'-ই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত, বাঙালি সম্পাদিত সাময়িক পত্র। স্বদেশবাসীকে উপযুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিজ্ঞান-কারিগরী-চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিজ্ঞান-কারিগরী-চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে অবগত করার মহান দায়িত্ব বহন করতো 'সম্বাদ কৌমুদী'। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে রামমোহন রায় যে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ হাজির করা যায় একটি তথ্য। ১৮২২ এ ডক্টর জেমসনের অধীনে কুড়িজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

সামাজিক নানা বিষয় যেমন, হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য স্থায়ী শ্মশানঘাট, বিধবাবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, শিশুহত্যা, সতীদাহ দিয়ে নিয়ে 'সম্বাদ কৌমুদী'-তে লেখালেখি ও চিঠিপত্র ছাপনোর মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। অপরদিকে হিন্দুর সম্পত্তি অধিকার আইনের সংশোধন চাওয়া, অপরিণত বয়স্কদের সম্পত্তির অধিকার দান নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব, বিদেশী শাসনের একপেশে অন্যায় নীতি, স্বদেশবাসীর নিরাপত্তাহীনতা, তাঁদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক ব্যবহার, অন্যায় বিচার ব্যবস্থা সবকিছু নিয়েই 'সম্বাদ কৌমুদী' সমাজে একটা প্রতিবাদের স্ফূলিঙ্গ হিসেবে হাজির হয়। যে স্ফুলিঙ্গের মধ্যে লুক্কায়িত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দাবানল। রামমোহন রায়ের লেখনীতে বার বার ঝলসে উঠতে থাকে অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ করার বার্তা, প্রয়োজনীয় নির্দেশ, সংশ্লিষ্ট 'সংবাদ কৌমুদী' একসময় সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে পশচাৎপদ পরাধীন একটি জাতির মুখপত্র রূপে নিজেকে হাজির করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক উন্নতি, স্বাদেশিকতার প্রচারে 'সম্বাদ কৌমুদী' যেভাবে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল তার জন্য সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি অবিস্মরণীয়। প্রতিক্রিয়ায় সমাজ সংস্কারে 'সম্বাদ কৌমুদি'র ভূমিকা সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিদের অসন্তোষের কারণ হয়। স্বয়ং সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ভবানীচরণ পত্রিকা গোষ্ঠী থেকে বেড়িয়ে যান ১৮২২ সালে। ঐ বছর রামমোহন রায় স্বয়ং পত্রিকার দায়িত্ব নেন এবং শেষ পর্যায়ে সম্পাদকের দায়িত্ব নেন রামমোহন রায়েরপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়। 'সম্বাদ কৌমুদি'কে কেন্দ্র করেই রামমোহন রায় প্রত্যক্ষ এবং সচেতনভাবে সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করেন। বাংলার সংবাদপত্রের বিকাশে যোগ হয় এক নতুনমাত্রা। মাত্র তেরোটি সংখ্যার পর ভবানীচরণ ১৮২২ সালে বেড়িয়ে যাবার পর পত্রিকাটি আরো বারো বছর চলেছিল এবং ১৮৩৪ সালপর্যন্ত এটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সমসাময়িককালে দেশে শিক্ষিত মহলে ফার্সি ভাষায় বিদ্যাচর্চা করার মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। এইসব শিক্ষিতদের জন্য ফার্সি ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করার সংকল্প করেন রামমোহন রায়। ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল 'মিরাৎ-উল-আখবার (সংবাদের দর্পণ)' নামে রামমোহন রায়ের সম্পাদনায় একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি শুক্রবার ছিল প্রকাশের দিন। পত্রিকাটি দেশবাসীকে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনে সহযোগিতা করতো। একইসঙ্গে এই পত্রিকা শাসক শ্রেণীকে তার প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা কী এবং জনগণের অভাব অভিযোগে শাসকগোষ্ঠীর কী ভূমিকা হওয়া উচিত সে ব্যপারেও পত্রিকা নিজের মতামত জানাবে—এই ছিল উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে দেশে রামমোহন রায়ই প্রথম ব্যক্তি যে সংবাদপত্রকে গণমাধ্যম হিসেবে দেখার মানসিকতার জন্ম দিয়েছিলেন এবং সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

মিরাৎ পত্রিকায় জাতীয় সংবাদের পাশাপাশি নানান ধরনের আন্তর্জাতিক সংবাদও গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হতো। এই পত্রিকায় রাজনৈতিক আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পেতো, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনো বিরোধ তিনি মানতেন না ফলে ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কিত রামমোহনের মতাদর্শ এই পত্রিকায় একই সঙ্গে প্রচারিত হতো। উল্লেখ্য, ধর্ম বলতে রামমোহন সঠিক কী বুঝতেন তা সূচনাতেই আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে ফলে বিতর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ যেন না থাকে এবং সর্বোপরি সমসাময়িক কালের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রয়াসটিকে বিশ্লেষণ করাই হবে যুক্তিযুক্ত। গণতন্ত্রকে সমর্থন করলেও, অনভিজ্ঞ জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বিরূপ মন্তব্য পোষণ করতেন। মুসলিমদের সম্পর্কে বিদেশীদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা দূর করার জন্য রামমোহন স্বয়ং হাফেজের বয়ান অনুদিত করে মুসলিমদের উদার ধর্মবাদ সুফী ধর্মীয় নীতিগুলিকে পত্রিকা মারফৎ প্রচার করেন। দেশ বিদেশের যে কোনো ঘটনার সংবাদ ও সে সম্পর্কে তার মতামত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে রামমোহন রায় যথার্থ সাংবাদিকের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ‘সম্বাদ কৌমুদি’ ও ‘মীরৎ-উল-আখবার’এ রামমোহনের মুক্ত চিন্তার এবং গণচেতনা জাগানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে একদিকে যেমন রক্ষণশীল সমাজ রক্ষকরা তথা শাসক শ্রেণীর একটি অংশকে ক্ষুব্ধ করেছিল অপরদিকে দেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ এবং শাসকের একটি অংশের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিল। এ দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই উক্ত সংবাদপত্রের বেশ কিছু নিবন্ধ সরাসরি সমসাময়িক ইংরাজী পত্রিকায় স্থান পেতো এবং রীতিমতো সেই পত্রিকাগুলোতে সমালোচনা আহূত হতো এবং এই কারণেই রামমোহনের এষণা ঐতিহাসিকদের কাছে তথ্যসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮২৩ সালে অ্যাডামের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণকারী মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ আইন তখন বলবৎ। কলকাতার বিশপ ডঃ মিলটনের মৃত্যুতে কাগজে প্রকাশিত শোক সংবাদকে কেন্দ্র করে ত্রিত্ববাদ নিয়ে কিছু মন্তব্য এবং পারস্যের রাজকুমারের সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাৎকার নিয়ে সরকারী কিছু অতিরঞ্জিত সংবাদের প্রেক্ষিতে সমালোচনা মিরাৎ উল আখবার-এ প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকাটি উক্ত আইনবলে শাসকের রোষানলে পড়ে। গর্জে ওঠেন রামমোহন। দেশের শিক্ষিত জনগণের প্রতি অবমাননাকর এই আইন রদে এবং দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি পথে নামেন। সুপ্রিম কোর্টে কালা-আইনটি বাতিলের জন্য তিনি আবেদন করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে তিনি আবেদনটি পেশ করেন যাদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। আবেদন পত্রটি পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে পরিচিত লাভ করে। রামমোহন জীবনীকার মিস কলেট এই আবেদনপত্রটিকে ভারতীয় ইতিহাসের ‘অ্যারিওপ্যাগিটিকা’ বলে উল্লেখ করেছেন।

‘ব্রাহ্মণ সেবধী’কে সবাদপত্র বলা যায় কিনা তা বিতর্কের বিষয়, ‘মিরাৎ-উল আখবার’ এর মধ্যে সংবাদ কতোখানি প্রতিফলিত হয়েছে তাও বলা কঠিন কারণ তার মূল কপি খোঁজার কাজ আজও গবেষকেরা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে এবং নির্ভক সাহসী সংবাদপত্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎকালীন সময়েও রামমোহনের যে ভূমিকা দেখি নিঃসন্দেহে তা প্রণিধানযোগ্য। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ-এর বিরুদ্ধেই রামমোহনের সেই বিখ্যাত উপলব্ধি, ‘হৃদয়ের শত শত ফোঁটা শোণিতের বিনিময়ে অর্জন করেছ যে অমূল্য সম্মান, প্রিয় মোর, তুচ্ছ দারোয়ানের অনুগ্রহ পাবার আশায় তাকে করোনা বিক্রয়।’

‘মীরাৎ-উল-আখবার’-এর পাশাপাশি রামমোহন রায় ১৮২২ এর মার্চ থেকে প্রকাশশুরু করেন সংবাদপত্র ‘জান-ই-জাহাপনামা’। অবশ্যই সাপ্তাহিক। ১৮২২-এর ১২ মে থেকে এই পত্রিকার এটি অষ্টম সংখ্যা থেকে উর্দু

ও পারশিয়ান ভাষায় ভারতীয় সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশ হতে শুরু করে। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামে আরেকটি পত্রিকার মালিকও ছিলেন রামমোহন রায়। প্রথম প্রকাশনা ১০ মে ১৮২২। সম্পাদক ছিলেন মেরি মারলিন। চারটি ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। আজকের সংবাদপত্রের যে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত। দুশবছর আগে সেই চেহারা আশা করা যায়না। তাই সম্পাদক হিসেবে রামমোহনের ভূমিকা ও অবদান যতোখানি সাংবাদিকহিসেবে হয়তো ঠিক ততোটা নয়। সেটা সম্ভবও ছিলনা। সেকালের সমস্ত সংবাদপত্র কিংবা সাময়িক পত্র ইংরেজ কর্মচারী অথবা ইংরাজী জানা মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বাঙালি নির্ভর ছিল ফলে সেইসব সংবাদপত্রের বিকাশ ও অগ্রগতি এই শ্রেণির প্রতিনিধিদের ঘিরেই গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেই ঘরানার পরিবর্তনে রামমোহনের ভূমিকা প্রমাণ করে যে তিনিই প্রথম ভারতীয় যে তৎকালীন যুগাবয়বে প্রকাশনা ও সাংবাদিকতাকে সামাজিক ভাবনায় সংশ্লিষ্ট করে জনমত সংগঠনে প্রয়োগ করেছিলেন। তৎকালীন সীমাবদ্ধ সংবাদপত্র জগতে কলকাতা ভিত্তিক মুদ্রণ শিল্পের হাত ধরে সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটেই হওয়া উচিত রামমোহন রায়ের বিশ্লেষণ। উনিশ শতকের পূর্বে কলকাতার সংবাদপত্রের জন্যই লড়াই কোনও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঐ শতকের প্রথম অর্দ্ধে এই মাটির সন্তানদের বিনষ্ট করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একই শতকের দ্বিতীয় অর্ধে (বা পর্যায় বলা ভালো) রামমোহনের নেতৃত্ব একই প্রজন্মের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাম্য-মৈত্রীর স্বাধীনতার উচ্চাকাঙক্ষার সঙ্গেই মানুষের অধিকারের অংশ হিসাবে গণ্য করেছে সংবাদপত্রের ধারণাটিকে। যদিও হিকি থেকে বাকিংহামের সংবাদপত্র জগত রামমোহনের কাছে একটা প্রেক্ষাপট হিসাবেই ছিল। আর ধারণা ছিল বলেই হয়তো বাঁধন ছেড়ার প্রচেষ্টাও ছিল প্রবল। এই প্রবলতাকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং রামমোহন রায়ই।

১৮৩০/১৫ই নভেম্বর। ভারত পথিক রামমোহন রায় বিলেত যান এবং ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সেখানেই তাঁর মত্যু হয়। অর্থাৎ তাঁর ধর্মজীবন এবং কর্মজীবন এদেশে মাত্র ১৫ বছরের, ১৮১৮ থেকে ১৮৩৩। আর সংবাদপত্রের সাথে তাঁর যুক্ত থাকার সময় মাত্র ৯ বছর, ১৮২১ থেকে ১৮৩০। অথচ অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের যথাক্রমে শেষ ও শুরুর পর্বে, বাংলার ও উনিশ শতকের যথাক্রমে শেষ ও শুরুর পর্বে, বাংলার ক্ষেত্রে যে বিষয়েই আলোচনা হোক, রামমোহন রায়কে বাদ দিয়ে তা হওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে রামমোহন রায়কে দেখার ও দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আছে বহু দ্বিধা দ্বন্দ্ব, বিতর্ক কিন্তু সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে আমরা যদি শুধুমাত্র সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই মহানপুরুষকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে তাকে যে এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বলা যায় তা নিয়ে কোনও বিতর্কের অবকাশ থাকে না।

সূত্র :

১. নিবন্ধ, জার্মান ইনস্টিটিউট অব অল্টারনেটিভ এনার্জির এক ইঞ্জিনীয়ারের লেখা।
২. ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ (প্রধান সম্পাদক সম্পাদিত রামমোহন রচনাবলী)।
৩. বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য বই।
৪. শ্রীরামপুরের ইতিহাস

নজরদারি 'রাষ্ট্র' ও 'মিডিয়া'

কৃশানু দেব

'নজরদারী'—এই শব্দটা শুনলেই যেন সাসপেন্স থ্রিলার মনে হয়! তাও আবার রাষ্ট্রের? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের? বাস্তবটা কিন্তু ঠিক সেরকমই। আজ আমাদের দেশ তথা দশের তথ্যের ভাণ্ডারের ওপর দখলদারি, তার সরবরাহ এবং সর্বোপরি মিডিয়ার পরিসরে তথ্যের ওপর রাষ্ট্র ও কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণ সর্বাত্মক। সময়ের সাথে সাথে পরিকাঠামোয় ব্যাপক বদল ঘটছে। উল্টোদিকে তেমনই প্রতিক্রিয়াগুলোও তীব্র ও স্পষ্ট হচ্ছে। নাগরিকের তথ্য জানার সক্ষমতা বাড়ার আপাত সম্ভাবনার আড়ালে আদতে মিডিয়া-পরিসরে সঙ্কুচিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে নাগরিক সক্রিয়তা।

একটু পিছিয়ে যাই। যে সময়কালে আজ আমরা জীবনযাপন করছি তার সঞ্চারপথের সম্যক ধারণা পেতে গেলে অনেকটা পেছন ফিরে তাকাতে হবে এবং তা সঠিকভাবে বুঝতে হয়তো আমাদের অনেকেরই জীবন কাবার হয়ে যাবে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আজ মিডিয়ার ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। জোহানাস গুটেনবার্গের (Johannes Gutenberg) ছাপাখানা আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের তথ্য সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আবিষ্কারের চার শতক পর্যন্ত ছাপাখানা, সমাজজীবনে যে পরিবর্তন বা রূপান্তর এনেছে তা আবিষ্কারের (১৪৪০) পঞ্চাশ বছর পরেও (১৪৯৫) মেঈনজ (Mainz) শহরের (গুটেনবার্গের বাসস্থান) কোন বাসিন্দার পক্ষেই ঠাহর করার কথা নয়, তাঁরা তা পারেনও নি। নবজাগরণের চরৈবেতিতে ক্যাথলিক চার্চের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে, ব্রুনোর মতো মানুষদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে আধুনিক বিজ্ঞানের পথচলা তা তথ্য পরিবেশনার জগতে আজ ছাপাখানা, বেতার, দূরদর্শনকে পার করে গত দিন দশকে ডিজিটাল কনভার্জেন্সের 5G/ মেটাভার্স পরিষেবা ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, তৈরি হয়েছে এর আগে না শোনা বহু জীবিকা ও শিল্প, আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে আমাদের চিন্তাভাবনার জগতে এমনকি শৈশবযাপনেও। এছাড়া আরো অনেক, অনেক কিছু। তবে, যে মৌলিক প্রশ্নটা এখন সবকিছু ছাপিয়ে বারবার সামনে চলে আসছে সেটা হল রাষ্ট্র ও কর্পোরেট পুঁজিবাদের সাঁড়াশিতে তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে নাগরিক সক্ষমতার সংকোচনের বিষয়। ১৪৯৫ কেন উল্লেখ করলাম? কারণ ডিজিটাল টেকনোলজির উদ্ভবের পর থেকে আমরা সমদূরত্ব প্রায় পাঁচদশক অতিক্রম করে ফেলেছি। যদিও খুব ধাপে ধাপে আমাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে এই নতুন যুগে খাপ খাইয়ে নেওয়ানো হচ্ছে তবুও আমাদের ধারণাই নেই যে আমরা কোথায় যেতে চলেছি, সবটাই যেন সেই প্রাচীন লোককথার 'অন্ধের হস্তীদর্শন'-এর গল্পের মতো—সবাই কিন্তু দেখছে আংশিক ছবি, কেউই পুরোটা দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের সচেতনতার এই স্তরটাকে খ্যাতনামা সাইবারস্পেস বিশেষজ্ঞ ম্যানুয়েল কাসলস্ (Manuel Castells) বলেছিলেন informed bewilderment। তাই, মত বিনিময়ের এই পরিসরে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত স্তরে এবং গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকটা নেতিবাচক প্রবণতার উল্লেখ করছি যা নয়া উদারবাদী জমানায় আজ আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে।

প্রথমতঃ, যেটা বলতে হয় যে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হয়ে গেলেও মিডিয়ার স্বাধীনতার সঙ্কোচন আজও অব্যাহত। আজ শাসকশ্রেণী তথা সরকার প্রেসের স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক সহনশীলতার ন্যূনতম শিষ্টাচার বজায় রাখতে রাজি নয়। সংবাদ মাধ্যমের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও চলছে হস্তক্ষেপ। চ্যানেল কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ তৈরী করে সম্পাদক, সংবাদদাতা, সংবাদ উপস্থাপককে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। শাসকের না-পসন্দ সংবাদ পরিবেশিত হলে চাকরি রাখাই মুশকিল, প্রোমোশন, বেতন বৃদ্ধি তো পরের কথা। পরিবেশিত সংবাদ পছন্দ না হলে সাংবাদিকের নামে থানায় FIR করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো শাসকের এই ভূমিকা সংবাদমাধ্যমের একটা বড়ো অংশ মেনেও নিয়েছে। সরকারি বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করে মিডিয়ার সম্পাদকীয় নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ভিন্নমতের সংবাদ পরিবেশনার রোষানলে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন তোলার সাংবাদিকসুলভ প্রবণতা ক্রমশ দমিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিষয় বা নাগরিক অধিকার হরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কোনো কোনো তথাকথিত প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম দায়সারাভাবে দু'চার কথা বলার পরেই বিষয়টিকে অপ্রসাঙ্গিক করে দিচ্ছে। এক প্রশ্নহীন জনমত বিবর্জিত নাগরিক সমাজ তৈরীর উদ্যোগ-মত বিবর্জনের রাজনীতি (politics of exclusion)। এর সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ। এমনকি স্বাধীন মতপ্রকাশের আধিকার কিভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তার উদাহরণ—নরেন্দ্র দাভোলকর, দানিশ সিদ্দিকী, গৌরী লঙ্কেশের মৃত্যু।

দ্বিতীয়তঃ, এটাও ঠিক যে, স্বাধীনতার আগে থেকেই বাণিজ্যিক মিডিয়া মুনাফা লাভের জন্য সচেষ্ট ছিল। স্বাভাবিক। তবে, main stream বাণিজ্যিক মিডিয়া fourth estate হিসাবে বহুবছর পর্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু, আজ? স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রে মিডিয়া হাউসের মালিকানা ও বিজ্ঞাপনের প্রসাদের ওপর সাতিশয় নির্ভরতা কর্পোরেট পুঁজির আবাহনের রাস্তাকে রাজপথ করে তুলেছে। 'স্বাধীন' দেশের 'স্বাধীন' মিডিয়া আজ আম-জনতার প্রতিনিধিত্ব করার বদলে পুঁজি ব্যবস্থার দোসর হয়ে উঠেছে। নয়া উদারবাদী এই জমানায় এটা আর বলা যাচ্ছে না যে সরকারী মালিকানাধীন মিডিয়াই 'পক্ষপাতদুষ্ট' বরং পেশাদার ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'স্বাধীন' মিডিয়ার জনস্বার্থবাহী ভূমিকা আজ বিপর্যস্ত। প্রযুক্তি যতই বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহায়ক হোক, যতই বহুত্ববাদী অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ুক না কেন, বড় পুঁজির একচেটিয়া আগ্রাসন স্বাধীন প্রেসের ভূমিকাকে খর্ব করছে। মিডিয়া কী ছাপবে, কী লিখবে, কী দেখাবে তা ঠিক করে দিচ্ছে বিনিয়োগকারীরা, বিজ্ঞাপনদাতারা। আর, এখানেই আসছে নজরদারির প্রশ্ন। এই কর্পোরেট মিডিয়ার নিরন্তর নজরদাররা এটা বোঝে যে দেশের সিংহভাগ নাগরিক ভালো ক্রেতা (potential consumer) নয়, তাই এই প্রান্তিক, দারিদ্র্যসীমায় থাকা আমজনতা media space এর আওতার বাইরে, তাই তাঁদের ব্যাপারে এই মিডিয়া উদাসীন, ফলতঃ বৃহত্তর নাগরিক সমাজ থাকছে ব্রাত্য হয়ে। এই কর্পোরেট মিডিয়ার সাঙাৎ হয়ে একদিকে সরকার যেমন ঢালাও বেসরকারীকরণ, বিলগ্নিকরণ করছে আর পক্ষান্তরে মিডিয়া তার হয়ে সওয়াল করে চলেছে। একে অপরের পিঠ চাপড়ে চলছে। এক চমৎকার যুগলবন্দীর কুনাট্য! একদিকে social welfare খাতে কার্যকরী বাজেট বরাদ্দ লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে অন্যদিকে ধান্দাবাজ পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে থাকা মিডিয়া তার পক্ষে জনমত তৈরীর কাজ করে যাচ্ছে। খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই এই মিডিয়া পরিসরে জায়গা পায় না। ফলে সরকারকে আর কষ্ট করে জরুরি অবস্থার মতো censorship জারি করতে হচ্ছে না। শাসক

ভজনার এই নির্লজ্জ রূপ কোনো make up অতিরঞ্জনীতেই আর ঢাকতে পারছে না।

তৃতীয়তঃ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই সময়ের আবর্তে আমরা এটাও দেখছি বাজারসর্বস্ব মিডিয়া দেশ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত সমস্যার প্রশ্নে মূলগত বিষয়গুলোক এড়িয়ে চলছে। মিডিয়ার একটা বড় অংশ নিজেদের 'স্বাধীনতার' বিনিময়ে গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে deviate করে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনকে space দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের বিভাজন আজ রাজনৈতিক পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। তাই, এ প্রশ্নে শাসকের সঙ্কট/অস্বস্তি যত বাড়ছে ততই ঘন হচ্ছে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আঁতাত। পরিচিতিসত্ত্বার রাজনীতি আজ তাদের সম্বল। বহুল প্রচারিত মিডিয়াগুলো দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবন জীবিকার মূল সমস্যাগুলোকে পেছনে রেখে সাজানো (framed) দ্বৈরথের কুনাট্য সামনে এনে এক binary option জনগণের সামনে হাজির করছে, মূল লক্ষ্য হল সংখ্যাগুরুর ফ্যাসিবাদকে মদত দেওয়া।

চতুর্থতঃ, আজ Artificial inteligence (AI) এর ব্যবহার সর্বত্র-এর স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন, ডিজিটাল ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্স, নেটফ্লিক্স, অনলাইন মিডিয়া যেমন—অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ওয়েবসাইট, ডিজিটাল মিডিয়া যেমন—ফেসবুক, ট্যুইটার, ব্লগ সব জায়গায়। এসব মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদান-এর ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী এবং অন্য চিরাচরিত মাধ্যমে থেকে অনেক দ্রুত। আপাতভাবে প্রযুক্তিগত এই সুবিধা citizen journalism এর নতুন প্রান্তরের জন্ম দিলেও ফ্যাসিবাদী শাসক তা ভালো চোখে দেখছে না। মিডিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি নাগরিকের জ্ঞাপন সক্ষমতার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে সরকার তৎপর। তাই Information Technololgy Act -কে সামনে রেখে চলছে স্বৈরাচার। প্রচলিত মিডিয়ার চেয়ে অনলাইন মিডিয়ার ওপর সরকারী নজরদারী ও নিয়ন্ত্রণের অভিঘাত অনেক গভীর এবং ব্যাপক। ব্যক্তিগত সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোর ওপর চলছে নজরদারী। নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সাংবিধানিক অধিকার আক্রান্ত। Pegasus software! অতি পরিচিত শব্দবন্ধ। AI কে কাজে লাগানো হচ্ছে নজরদারীতে। বেশিরভাগ মানুষ এটা বুঝতেই পারছেন না যে এই ব্যবস্থা কত দ্রুততার সঙ্গে তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন, তার মানোন্নয়ন একটি সদর্থক এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটা দোষাবহ নয়। কিন্তু তার ব্যবহার? অপব্যবহারের আশঙ্কার ক্ষেত্র? অবশ্যই যথেষ্ট উদ্বেগের রসদ আছে। অভিজ্ঞতা কী বলে? আজকে এই AI-কে সরাসরি ব্যবহার করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে, নিরন্তর নজরদারী চালানো হচ্ছে সোস্যাল মিডিয়াতে, স্মার্টফোনে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিষয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়তা এক বিষয় আর অসৎ উদ্দেশ্যে geopolitical supremacy purpose এ তা ব্যবহার করা অন্য বিষয়। সারা পৃথিবীজুড়ে global surveillance-এর বীজ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, ভুল, মিথ্যে সর্বোপরি অর্ধসত্য খবর, গুজব ছড়ানোর ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা মারাত্মক। এমনকি অতীতকে মুছে দেওয়া হচ্ছে, ইতিহাসকে বিকৃত, বিনির্মাণ করা হচ্ছে। এই 'deep-fake' এর নেপথ্যেও থাকছে AI প্রযুক্তি যেখানে জাল ভিডিও এবং অডিও তৈরি করে সার্কুলেট করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একজন প্রার্থী যদি বিরোধীপক্ষের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জাল ভিডিও এবং অডিও-যা আদপে ঘটেইনি তা প্রকাশ করার মতা অনৈতিকতার সাহায্য নিয়ে জল ঘোলা করার চক্রান্ত করেন এবং ঘটনাচক্রে তিনি যদি ক্ষমতাসীন থাকেন তবে তো কেল্লাফতে হয়েই গেল!

পঞ্চমতঃ, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে দমনে আগ্রাসী মনোভাব ও কর্পোরেট মিডিয়ার

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও শাসক নিশ্চিন্ত নয়। তাই, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংকট যত বাড়ছে ততই বাড়ছে সরকারী প্রোপাগাণ্ডার বহর। আগেও সরকারী প্রচার, বিজ্ঞাপন ছিল কিন্তু post truth জমানায় আম আদমির মগজধোলাই হচ্ছে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শাসকদের লক্ষ্য। যাতে রয়েছে পরিকল্পিত মিথ্যাচার, মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। প্রচারের এই মেলা চলছে আম আদমির দেওয়া করের টাকায়। রাজস্ব সংগ্রহের অছিলায়, সরকারী সম্পদ যেখানে জলের দরে পেটোয়া পুঁজিপতির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে শাসকের ভাবমূর্তির ঘষামাজায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান খাতে যেখানে কার্যকরী বরাদ্দ নেই সেখানে বছরে বছরে কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে তাঁদের আত্মপ্রচারে। বিরোধী বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। আচ্ছা, ব্রিটেনে BBC-কে এইভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবা যায়? ব্যাঙ্কের ATM Card হোক বা কোভিড টীকার সার্টিফিকেট, শৌচালয় হোক আর চিড়িয়াখানায় পশুশাবকের জন্ম, চলচ্চিত্র উৎসব হোক আর দুর্গোৎসব সর্বত্র শাসকের প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটি পরিসরে। সবই সরকারী অর্থের দ্বারা। একাধিক মিডিয়া হাউসের মালিক বা শীর্ষকর্তা শাসকদলের তাঁবেদার হয়ে আইনসভার সদস্য। অর্থের বিনিময়ে প্রচার চলতেই পারে, বেআইনি কিছু নয়, বিজ্ঞাপনও তো এক অর্থে প্রচার। কিন্তু, গোপন লেনদেন, বানানো, রং-চড়ানো, বাস্তব বিবর্জিত খবর 'তৈরি' (paid news) করা তো অন্য বিষয়। সরকারি প্রচার ব্যবস্থার এই মেশিনারী আসলে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিনিময়ের স্বাধীন ও বহুত্ববাদী digital platform কে দখলের মধ্য দিয়ে তথ্য প্রবাহের ওপর নাগরিক অংশীদারিত্বকে কোণঠাসা করে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতে তৎপর।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের প্রথম মহিলা প্রোফেসার সোজানা জুঁবফ (Shoshana Zuboff) বদলে দিলেন কম্পিউটারাইজেশন ও তার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ধারণা। এই প্রযুক্তি আমাদের পেশাগত জগতে কী পরিবর্তন সাধন করেছে তার একটা নিখুঁত দলিল (২০১৫-১৬) তিনি তুলে ধরলেন তাঁর গবেষণালবদ্ধ ফসলে যেখানে তিনি দেখালেন গুগল, ফেসবুক প্রভৃতি এক নতুন ধাঁচার পুঁজিবাদের আমদানি করেছে। অনেক বড় একটা বিষয়। এই ডিজিটাল প্রযুক্তি আসলে পুঁজিবাদের এক নতুন মিউট্যান্ট, জুঁবফ যার নাম দিয়েছেন 'surveillance capitalism'। সাধারণভাবে এই কাজটা করে আমাদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়া সার্চ ইঞ্জিন, যেমন—গুগল এবং সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেমন—ফেসবুক। এরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে ফ্রি-সার্ভিস দেয়, মানুষ সানন্দে তা ভোগ করে পরিবর্তে আমাদের লাইক, ডিসলাইক সার্চ, অনলাইনে কেনাকাটা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করে আমাদের আচরণ বা প্রবণতার আন্দাজ করে পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তার সওদা করে। তথ্যলব্ধ জ্ঞানই ক্ষমতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আমি যত আপনার সম্পর্কে, আপনার আচরণ সম্পর্কে জানব আমি তত বেশী ভালোভাবে আপনার আচরণ সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারব এমনকি আপনার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। এই ডিজিটাল নজরদারী ব্যবস্থা এতটাই সূক্ষ্ম ও মসৃণভাবে তৈরী যে তা আপনার চেতনার বৃত্তের বাইরে অবস্থান করছে অর্থাৎ এই ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটছে আপনার অগোচরে, নাগালের বাইরে, নিঃশব্দে কোনোরকম নির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়াই! জুঁবফ বলছেন যে surveillance capitalism একটা একতরফা প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা হল রসদ (resource) আর তাঁর আচরণগত তথ্যগুলো computed package হিসাবে prediction product এ পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে ভবিষ্যত বাজারে অন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চালান/বিক্রি হয়ে যায় নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক ক্রেতার কাছে। অর্থাৎ আমরা কী করছি, কী করব

বা কী করতে চলেছি এই সবকিছুই। শুধু নিরীক্ষণেই আর সীমাবদ্ধ নেই বিষয়টা, এই নজরদারী পুঁজিবাদ তাদের মুনাফার জন্য উপভোক্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সন্তর্পণে জোরালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করছে। আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের ওপর আমাদের অধিকার, নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। এটা কী আমরা চাইছি? এটা তো মুক্ত চিন্তা-ভাবনার চাবিকাঠি যে আমি আমার বর্তমান কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে আমার ভবিষ্যৎ যাপনসংস্কৃতি নির্ধারণ করব। এটাইতো মানবসমাজের চিরন্তন স্বাধিকার। মানুষের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (human autonomy) এর ভিত্তি হল সচেতনতা, আর সেটাই যদি না থাকে? গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রইলটা কী? তারা আমাদের সবকিছু জানে অথচ আমরা তাদের কিছুই জানি না! আমরা দৌড়চ্ছি ইন্টারনেটের দিকে যাতে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস হয়, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আরো গণতান্ত্রিকতা আসে কিন্তু, বাস্তবে আমরা আরও সমস্যার ফাঁদে পড়ছি। আধুনিক এই বিশ্ব ব্যবস্থায় information বা তথ্য হচ্ছে resource বা সম্পদ আর এর বিপরীতে তথ্যহীনতা বা তথ্যের অপ্রতুলতা হচ্ছে সম্পদহীনতা। নাগরিকদের করের টাকা খরচ করে সেই তথ্যভাণ্ডার বা তথ্যপ্রবাহ থেকে নাগরিককে বিযুক্ত করতে চাইছে সরকার এবং তার পুঁজিপতি দোসর। এরা এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা (spectator democracy) গড়ে তুলতে চাইছে যেখানে নাগরিকরা থাকবেন প্রশ্নহীন নির্বাক দর্শক (silent spectator) হয়ে। আমজনতার হয়ে সরকারের ওপর নজরদারী করা যার কাজ, সেই মিডিয়া আজ পুঁজিবাদীদের হাতে পরে স্বৈরাচারী সরকার-এর হয়ে আমজনতার ওপর নজরদারী চালাচ্ছে, জনমত তৈরী করার চেষ্টা করছে। এটা soocial democracy র ওপর বড় আক্রমণ। ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে সাথে মুক্ত সমাজের ভবিষ্যতও আক্রান্ত। ডিজিটাল বিপ্লবের চমকদার অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রতিকূলতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপুঞ্জ স্থাপনের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, '...never let a good crisis go to waste...' একটা ভাল সঙ্কটকে কখনও অপচয় করতে নেই। অতিমারী, লকডাউন-এর প্রেক্ষাপটে সারা পৃথিবীর সঙ্গে দেশ তথা রাজ্যে তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও আমরা দেখেছি সরকারের চোখের সামনে শুধুমাত্র নিখাদ লাভের জন্য বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবাদানকারী সংস্থা থেকে বিমা সংস্থা মানুষকে কিভাবে প্রতারিত করেছে। সরকার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয় নি। আত্মনির্ভরতার নামে দেশের সম্পদ শিল্প-কারখানা বেচে দেওয়া হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত আজ পুঁজিপতিদের জিম্মায়। সংসদীয় রীতি নীতি, শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার মতামতকে উপেক্ষা করে, বিপর্যয় মোকাবিলা আইনকে ঢাল করে জনবিরোধী আইন প্রণয়ন তথা সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আম জনতার কাছে যেটা সঙ্কট, বেঁচে থাকার লড়াই সেটাই তাদের কাছে বিরাট opportunity, possibility!! নজরদারিকে আইনের মোড়কে ঢাকতে পার্লামেন্টে পেশ হয়েছে Personal Data Protection Bill 2018, এবং বিগত ডিসেম্বর ২০১৯ ক্যাবিনেটে তা গৃহীত হয়েছে, যদিও এখনও পাশ হয়নি। বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে সংক্ষেপে বলা যায় এই আইনে উল্লেখ রয়েছে জাতীয় স্তরে Digital Protection Authority (DPA) থাকবে যারা বিশ্বস্তভাবে (fiduciary) আমরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেখাশোনা করবে। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু, কার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে? সেটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে তো? এই বিল অনুসারে data processing করবে both government and private entities... এবং তা করতে The State is not required to seek the individual's consent while providing benefits or services(?)।

পাল্টা লড়াইটা তাই দরকার। কিন্তু কিভাবে? প্রকৃত অর্থে স্বাধীন মিডিয়া চাই। তথ্যের অবাধ আদানপ্রদান চাই। সুস্থ গণতন্ত্রে যা একান্তভাবে অপরিহার্য। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই নজরদারীকে আমরা কেন প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছি? অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমতঃ, স্পষ্ট করে বলা ভালো যে আমরা এই জাতীয় পুঁজিবাদী নজরদারীর দুঃসাহসী এবং অভূতপূর্ব কর্মকাণ্ডের সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা করতে শুরুর দিকে উপলব্ধি করতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ, গুগল যখন প্রথম এই ব্যবস্থার সূচনা করে তখন দুটো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে—এক, নিও-লিবারাল বহুমতের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার বিপক্ষে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্পোদ্যোগ ও বাজারের বিস্তার ঘটে, দুই, ৯/১১-এর সন্ত্রাসবাদী হামলা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ওজরকে সামনে রেখে আমেরিকার নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এই নজরদারীর পক্ষে সওয়াল করে যা পরবর্তীতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে। তৃতীয়তঃ, এর কৌশলগত ব্যবহার সম্পর্কে আমরা প্রাথমিকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলাম না। এই নজরদারীর সপক্ষে তখন পুঁজিবাদীরা যে বক্তব্য হাজির করেছিল তা' আপাতভাবে শ্রুতিমধুর শোনালেও তা ছিল চাতুর্যপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর। গোয়েবলসীয় প্রচারের কায়দায় মানুষকে বার বার বলা হতে লাগল যে এটা অর্থাৎ এই নজরদারী আসলে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের অপরিহার্য উপজাত। পশ্চিমী দেশগুলোতে বলা হতে লাগল যে এর বিরোধিতা করার অর্থ হল প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে বাধা দেওয়া! এখন কথা হল এটাই যদি ভবিতব্য মেনে নেন, তবে এই নিয়েই চলুন। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি যে surveillance capitalism ছাড়াও digital technology সচল কিন্তু digital technology ছাড়া surveillance capitalism এক পাও চলতে পারবে না। এবার দেখুন কী করবেন? এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিকল্পের উদ্যোগকে হতে হবে বহুমুখী ও বহুস্তরীয়। নাগরিকের স্বার্থেই এই ঝাঁ চকচকে স্মার্ট আপাত সুন্দর ব্যবস্থা বদলাতে তিনটে ক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমত, এক্ষেত্রে গণসচেতনতার মধ্য দিয়ে জনমত গঠন করতে হবে। গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী স্বাধীন মিডিয়া ব্যবস্থা দরকার। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নির্দিষ্টভাবে এই পুঁজিবাদী নজরদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়মের সংস্কার করতে হবে। তৃতীয়তঃ, বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুযোগের ন্যায্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর সম্পর্কিত তথ্য অন্যত্র ব্যবহারের আগে একজন ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীকে জানাতে হবে এবং সম্মতি নিতে হবে। যাতে তিনি সচেতন থাকতে পারেন পর্দার আড়ালে কী ঘটছে সে সম্পর্কে। প্রয়োজনে বিকল্প মিডিয়া পরিচালনার উদ্যোগ দেখাতে হবে। বিশেষতঃ অনলাইন পত্রপত্রিকা, ব্লগ, সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহার করতে হবে সর্বোত্তমভাবে। এরজন্য দরকার বিকল্প বিষয়, বিকল্প বাচন সাথে সাথে তার অনুশীলন। আজকের বাস্তবতায় media literacy বা মিডিয়া সাক্ষরতা খুবই জরুরী। মিডিয়া সাক্ষরতা বলতে এখানে বলতে চাইছি মিডিয়ার ভূমিকা, কাজের ধারা, তার রাজনীতি, তার অর্থনীতি। মিডিয়াকে শাসক কিভাবে ব্যবহার করছে, আগামীদিনে কিভাবে ব্যবহার করতে চলেছে তা বোঝাটা খুবই জরুরী। তাহলেই মিডিয়াতে যা ঘটছে তার কার্যকারণ বোঝা সম্ভব। এটা আর শুধু বিশেষজ্ঞদের বোঝার বিষয় নয়।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। আমাদের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশাগুলোয় যেন বিবর্ণ রং ধরছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপক্ষ কাঠামো থেকে শুরু করে সংবিধানের বুনিয়াদগুলো একে একে আক্রান্ত। একটা সার্বিক স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রে সমস্ত রীতি-রেওয়াজকে মুছে দিতে তৎপর। আইনসভা, বিচারব্যবস্থা ও সরকারি প্রশাসনে আন্তঃসম্পর্ক, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের পদ্ধতিসমূহ ভেঙে পড়ছে। লগ্নিপুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন গণতন্ত্ররূপী স্বৈরতন্ত্র

আজ সুকৌশলে রাষ্ট্র আর সরকারের দুটি সত্ত্বাকে গুলিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক আর সরকারের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক যে এক নয়, এই বোঝাপড়াটাকেই নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের মূলগত অবস্থানটাকেই উপড়ে ফেলার ফ্যাসিবাদী আধিপত্যবাদ তার থাবাকে আরো ধারালো, আরো শক্ত করছে। এটা কোনো দুর্ঘটনা বা আকস্মিক বিভ্রাট নয়, কোনো একক ব্যক্তির একনায়কতন্ত্রী ঝোঁকও নয়, এটা একা সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ। সঙ্কটের মধ্যেই নিহিত থাকে সম্ভাবনার বীজ! নির্ভর করছে আমাদের ওপরেও, আমাদের প্রত্যেকের সচেতনতায় ব্যক্তি হিসাবে এবং সমষ্টিগতভাবে। নির্ভর করছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতায়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ কার্যকারিতার ওপর। রাতারাতি এই পরিস্থিতি বদলে দেওয়া যাবে কি? এক কথায় উত্তর হল—না। একে রুখতে গেলে তা করতে হবে সচেতনতার সঙ্গে, সংগঠিতভাবে। রাস্তা কারও একার নয়।

...বিজ্ঞান যখন প্রেমের গান ভুলে ভাড়াটে জল্লাদের পোশাক গায়ে চাপায়, আর
রাজনীতির বাদশারা পয়সা দিয়ে তার ইজ্জত কিনে নেয়,
আর তার গলা থেকেও ধর্মের ষাঁড়েদের মতোই কর্কশ
আদেশ শোনা যায়: 'রাস্তা ছাড়ো!' নইলে—
পৃথিবীর কালো সাদা হলুদ মানুষের গান, তাদের স্বপ্ন
এক মুহূর্তে সেই চিৎকার শুনে থমকে তাকায়।

তারপর যার যেদিকে রাস্তা, সেদিকে মুখ করেই তারা সামনে,
আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায়।
কেউ কারোকে রাস্তা ছেড়ে দেয় না, যতদিন এই পৃথিবীতে গান থাকে,
গানের মানুষ থাকে, স্বপ্ন থাকে [*কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*]

ঋণস্বীকার: The Age of Surveillance Capitalism by ZUBOFF SHOSHANA, Published by Public Affairs, 2019 এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা।

পরিবেশ ও রাজনীতি

অম্লান দে

আপাতভাবে পরিবেশ একটি বিষয়। কিন্তু এর প্রভাব, এর অনুকূলতা, প্রতিকূলতা এবং সঠিকভাব জীবজগতের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক একটি নীতির প্রয়োজনীয়তা বর্তমান অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। সেখানেই রাজনীতির সাথে এর সম্পর্ক, উৎপাদন উপকরণ, ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন কৌশল এবং পরিবেশের সাথে এর গভীর সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক আবার অর্থনীতির সাথে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সেই অর্থনীতি আবার রাজনীতির বৃত্তভুক্ত। সহজভাবে পরিবেশ শুধুমাত্র একটি বিষয়গত ধারণা নয়, বৃহত্তর অর্থে তার উন্নয়ন, ক্ষয়-ক্ষতি এবং সেই ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ-এর নীতি নির্ধারণে রাজনীতির একটি বড় ভূমিকা থাকে।

পবিবেশের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনেকভাবেই দেওয়া যায়।

বোরিং (Boring)-এর মতানুসারে পরিবেশের সংজ্ঞা এইরকম—

"A person's environemnt consists of the sum total of the stimulation which he receives from his conception until his death indicating that environment comprises various types of forces such as physcial, intellectual, mental, economical, political, cultural, social, moral, emotional."

আবার ডগলাস এবং হলান্ড নিম্নরূপ সংজ্ঞায় পরিবেশকে সংজ্ঞায়িত করেছেন—

"The term environment is used to describe, in aggregate all the external forces, influences and conditions, which affect the life, nature, behaviour and the growth, development and maturity of living organism."

উপরিউক্ত দুটি সংজ্ঞা থেকেই এটা স্পষ্ট যে পরিবেশের সাথে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এবং এই ইস্যুর অগ্রাধিকারের প্রশ্ন বা তুলনামূলক অগ্রাধিকারের প্রশ্ন ভীষণভাবেই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক।

পরিবেশের সাথে জলবায়ুর একটি সম্পর্ক আছে। সুতরাং পরিবেশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জলবায়ু পরিবর্তনের বীজ যা সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কোন দিকে তা নির্দেশ করে।

এই প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের সংজ্ঞা নির্ধারণ জরুরি। বৈজ্ঞানিকদের মতে—

"Climate change refers to long-termshifts in temparaturers and weather patterns. These shifts may be natural, such as through variations in the solar cycle. But since the 1800s. human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning fossil fuels like coal, oil and gas.

Burning fossil fuels generates grenhouse gas emissions that act like a blancket wrapped around the Earth, trapping the sun's heat and raising temparature. Examples of greenhouse gas emmisons that are causing climate change included Carbon-di-Oxide and methane. These come from using gasoline for driving Car or Coal for heting a building, for example, clearing land and forests can also release Carbon-di-Oxide Landfills for garbage

are a major source of methave emissions. Energy, industry, transport, building, agriculture and land use are among the main emitters.'...

মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া গেল। পরিসংখ্যান বলছে বর্তমান বিশ্ব Greenhouse gas-এর সর্বোচ্চ পরিমাণবক্ষে ধারণ করেছে। ফলতঃ বিশ্বের তাপমাত্রা ১৮ শতকের শেষ দিকে যা ছিলতার তুলনায় ১.১°C বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১১-২০২০ এই দশক বিশ্বের উষ্ণতম দশক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তার পরিণামে খরা, বন্যা, জলের অভাব, দাবানল, মেরু অঞ্চলের বরফগলে যাওয়া, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি এবং ভয়ঙ্কর ঝড়ের প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। জৈব বৈচিত্রে পড়ছে ভয়ঙ্কর প্রভাব। আশঙ্কা করা হচ্ছে উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলিতে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক জলের স্তরের বৃদ্ধি, দ্বীপগুলিতে নোনা জলের ঢুকে যাওয়া সেখানের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে, এইকসাথে দুর্ভিক্ষ এবং ঝঞ্ঝার প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে ভবিষ্যতে 'Climate Refugee' এই শব্দবন্ধ শুধুমাত্র ব্যাপকতা সৃষ্টি করবে না, তা ভূ-রাজনৈতিক নানাবিধ সমস্যাও তৈরী করবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং বিভিন্ন দেশের পর্যায়ক্রমিক রিপোর্টগুলি পড়লে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। সকলেই সহমত যে ভূ-উষ্ণায়নের মাত্রা ১.৫°C-র নীচে রাখতেই হবে না হলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে অথচ বিভিন্ন কার্যকর নীতির উপর দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে এই শতাব্দীর শেষে ভূ-উষ্ণায়নের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ২.৮°C।

পৃথিবীর সর্বত্র মানবসৃষ্ট কার্বন-নিঃসরণ ঘটছে, যদিও তার পরিমাণগত তারতম্য আছে এবং খুব নির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করলে বলাই যায় যে ব্যাপক তারতম্য আছে। ১০০টি সর্বাপেক্ষা কম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ যেখানে মোট কার্বন নিঃসরণের মাত্র ৩% কার্বন নিঃসরণ করে, সেখানে শিল্পোন্নত ১০টি দেশ মোট পরিমাণের ৬৮% কার্বন নিঃসরণ করছে। পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত রাখার দায় সবার আছে কিন্তু ক্ষতি যাদের মাধ্যমে বেশী হচ্ছে তাদের দায় অনেক বেশী। আবার দায় বেশী যাদের, তাদের দায় ঝেড়ে ফেলার প্রবণতা ও কৌশলও অনেক বেশী এবং সব কিছু একসাথে বিবেচনা করলে যে বিষয়ে নিশ্চত হওয়া যায় তা হল পরিবেশ বা জলবায়ুর উপর যে চাপ তৈরী করা হচ্ছে তা বহুলাংশে মনুষ্য সৃষ্ট এবং আরো নির্দিষ্টভাবে বললে তার নেপথ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মদত সুস্পষ্ট।

পরিবেশবিদরা প্রায়শই পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার মূল কারণ হিসাবে জনবিস্ফোরণকে দায়ী করেন এবং জনবিস্ফোরণের ফলেই প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহারের তত্ব তুলে ধরতে চান। নিঃসন্দেহে জনবিস্ফোরণ প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহারের একটি কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির দায় কিছু কম নয়, যে অর্থনীতি ব্যক্তিগত পুঁজির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কথা, মুনাফার কথা অন্তর থেকে ঘোষণা করে। বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ স্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকা সত্ত্বাগুলিকে বাধ্য করে উৎপাদন খরচ কম করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে, মুনাফার মাত্রা বাড়িয়ে অগ্রসর হতে, আর উৎপাদন খরচ কম করার জন্য কমদামী প্রযুক্তি ব্যবহারে (যা প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের ক্ষতি করে) তারা তৎপর। অধিক উৎপাদন-অধিক ব্যবহার-অধিক মুনাফা মূল ভিত্তি যেখানে সেখানে উদগ্রতা বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং তার প্রভাব পরিবেশের উপর নেতিবাচক হলেও সেখান থেকে সরে আসার নৈতিক দায় পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্বীকার করে না, আর তাকে বাধ্য করতে চায় না রাজনৈতিক ক্ষমতা, উপরন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দেয়। সেখানে 'সুসংহত বিকাশ'-এর ধারণা বস্তাপচা এবং অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে গণ্য হয়। সুসংহত বিকাশের ধারণা মর্যাদা পেলে বিষয়টি

অন্যরকম হতে পারতো। বসুন্ধরা সীমাহীন উৎপাদন এবং ভোগ গ্রহণ করতে পারছে না, সুতরাং দ্বন্দ্ব উপস্থিত হচ্ছে।

Erick Wright, Wisconsin–Madison বিশ্ববিদ্যালয়ের Economic sociologist বলছেন—'One way of cutting cost is to project some of that cost into the environment. Imagine, for instance, throwing a can of soft drink from a car window because this is a low cost way of disposing of a can, and being totally indifferent to its negetive impact on others, the same behaviour is often adopted by large business.'

প্রথমত: বাজার অর্থনীতিতে এই ধরণের ব্যবহারের কোন প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেই। বাজার বহির্ভুত শক্তি দ্বারাই একে প্রতিহত করতে হবে, হয় সেই শক্তি হবে রাষ্ট্র বা কোনো শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সামাজিক সংগঠনগুলি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করুক সেটা বাজার অর্থনীতি মেনে চলা রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক শক্তি চায় না। অর্থাৎ শক্তিশালী সমাজসংগঠন প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনায় ঝাঁপিয়ে পড়ুক এটা রাজনৈতিক ক্ষমতা চায় না, প্রশ্রয়ও দেয় না।

দ্বিতীয়ত: অচিরাচরিত প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ছোট প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়, পরিবেশের উপর এর প্রভাব বিবেচিত হয় না, মূল্যমান ও বৃহত্তর অর্থে ভাবা হয় না। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে Green-house Gas নিঃসরণের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯০ দশকের মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে, বিশ্ব একমেরু বিশিষ্ট হওয়ার পর থেকে, মার্গারেট থ্যাচারের 'There is no Atternartive'-এর পর থেকে যখন পুঁজিবাদ পৃথিবীর মানচিত্রের টুঁটি চেপে বিশ্বজুড়ে অবাধ দাপাদাপি শুরু করেছিল।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় পুঁজিবাদ স্বীকৃত অর্থনৈতিক নীতি, এবার দেখে নেওয়ার পালা পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও পরিবেশ, জলবায়ুর সম্পর্ক। David. P. Turner তাঁর 'Capitalism and the Global Environment' প্রবন্ধে বলছেন—

'...Important downsides includ growing inequality of wealth and income, both within and between nations, growing instability of the global financial system, and growing environmental degradations at all scales.'

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল সূত্র হল—'A capitalist organizes labour to manipulate natural re-sources and create products, which can then be sold in a competitive market. Income from product sales pays for the costs of production, for personal or corporate profit and pos-sibly for expansion of production'.

আবহাওয়া বা জলবায়ু বিষয়ে তোলা মূল বিষয়টি বিস্তার (expansion) এবং উৎপাদন মূল্য সীমিত (mini-mum) করার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু উৎপাদনের অসীম বিস্তার কি সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? উত্তর—'না।' ফলতঃ তীব্রতর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদেই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন হচ্ছে, হু হু করে বেড়ে চলেছে গ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ। জলবায়ুর পরিবর্তন যে সব কিছুকেই নেতিবাচক পরিবর্তনে পর্যবসিত করতে পারে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার নিয়ামকরা তা বুঝতে চাইছেন না। আনুষ্ঠানিক কিছু সভা, কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তাকে কার্যকরী করার তাগিদ আদৌ দেখা যাচ্ছে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ুতে যে ক্ষতের সৃষ্টি করছে তার নিরাময়ের ও সমাধানের পথ দেখাতে পারছে না। এই সময়ের বাস্তবতা

একটি পরিসংখ্যানে স্পষ্ট হয়। বিশ্বের ১০% ধনী মানুষের দ্বারা Green House Gas নিঃসরণের মাত্রা ৩৬%, যেখানে দারিদ্র সীমার নীচে থাকা ৫০% মানুষের দ্বারা সেই নিঃসরণের মাত্রা ১৫% (Liobi kience Rimkuvieeu)। কিন্তু, সেই ধারাকে প্রতিহত করার মূল দায় তো রাষ্ট্র শক্তির, রাজনৈতিক শক্তির। তাঁরা কি সেই দায়িত্ব পালন করছেন? New York times এর এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে "Most of Mr. Trump's environmental policies, which ereased or loosend nearly too rules and regulatiojns on pollution in the air, water and atmosphere, can be reversed though not immediately' Pollutauts like industrial soot and chemical can have lasting health effects, especialy in minority communities where there are often concentrated. But air quality and wather clarity can be restored once emissions are put back-under control." ঐ একই প্রবন্ধে নিঃসরণ নীতি থেকে প্যারিস সম্মেলনে ট্রাম্প-এর পিছু হটা এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবহাওয়া বিপর্যয়ের আশঙ্কাকে অমূলক বলে অভিহিত করার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—বিগত চার বছরে গ্রীণহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা আশঙ্কা করা পরিমাণেরও থেকেই বেশী বেড়েছে এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধি, হিমবাহের গলন, সমুদ্র স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভয়ঙ্কর ঝড়, দাবানলের মতো ঘটনাগুলি।

মনে রাখতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধুমাত্র ব্যক্তি নন, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা এবং নীতি নির্ধারক। যিনি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালবদ্ধ পরিসংখ্যান যা বলছে, গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাতাসে বর্তমানে ৪০০ p.p.m যাউষ্ণতা ২°সি. বৃদ্ধি করছে তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টি শুধুমাত্র যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত তাও নয়। বিষয়টি বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী সকল রাষ্ট্রের, বিষমিশ্রণে চীনও কম যায় না।

কিন্তু এর ফলে শুধু তো উন্নত বিশ্বের ক্ষতি হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর। ইউরোপের দাবদাহ, আমেরিকার তাণ্ডবের সাথে একইভাবে উচ্চারিত হচ্ছে পাকিস্তানের বন্যা, আম্ফান, যশের তাণ্ডবের নাম। উন্নত বিশ্বের অর্থনীতি যে ধাক্কা সামলাতে পারে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ বা জনগোষ্ঠী তার অর্থনৈতিক শক্তিতে তা সামলাতে পারে না। ফলতঃ আবার হাত পাতা এবং বলাইবাহুল্য তা নিঃশর্তে, ফলে উন্নতবিশ্ব সুলভে নিজের ভুরাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ আরো গুছিয়ে নিতে পারছে, আরো বেশী করে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের অধিকার হাসিল করছে। একি রাজনীতি নিরপেক্ষ? লুণ্ঠনের অর্থনীতিকে প্রয়োগভূমিতে স্থাপন করে তো রাজনীতিই।

১৯ শতকের শিল্পোন্নত দেশ শিল্পবিপ্লবের পর সমর্থন করেছিল সাম্রাজ্যবাদকে, নূন্যতম সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে নি প্রকৃতির উপর, শ্রমিকদের উপর।

সেই শোষণের সঞ্চরণের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে জন্ম দিয়েছিল যেখানে নুন্যতম মজুরি, স্বাস্থ্যনীতি এবং অবসরকালীন সুযোগকে রাষ্ট্র নিজস্ব কর্তব্য হিসাবে দেখেছিল, ১৯৬০-র দশকে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রাষ্ট্র তার দায় হিসাবে স্বীকার করেছিল। ১৯৮০-র দিকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে আবার 'Neoliberal State' প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করল (Reganomics এর কথা স্মরণ করুন) যেখানে সরকারি ভূমিকা হল কম, অসাম্য বাড়তে শুরু করল, উগ্র মুনাফার তীব্র প্রতিযোগিতা বাড়তে লাগল আর পরিবেশ বা জলবায়ুর ক্ষতি দ্রুত বেড়ে গেল।

এই অবস্থায় বর্তমান বিশ্বের কাছে মূল রাজনৈতিক দাবি হতে পারে Neoliberal State থেকে Green

State-এ রূপান্তরের দাবি। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সুসংহত বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিরাপদ রাখার, জলবায়ুকে সুরক্ষিত রাখার দাবি মূল রাজনৈতিক দাবি হোক। যে পৃথিবীতে অসাম্য থাকবে না। সম্পদের সুষম বণ্টন থাকবে, প্রকৃতির প্রতি মূল্যবোধ থাকবে।

না হলে..

বসুন্ধরা সম্মেলনে—বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন—'We can pay the bill now, or pay dearly in the future'... মনে পড়ছে ভদ্রলোকের নাম ফিডেল কাস্ত্রো।

"কথা ছিল উল্টোদিকে যাওয়া মানে প্রকৃতি বিজয়।
রাখা হবে বীজ আরও মাটির গভীরে।
মানুষ ও বৃক্ষশিশু খুঁজে নেবে আজন্মের ত্রাণ।
ধ্বংসহীন দিনলিপি লেখা হবে নদীদের তীরে।"

—রেহান কৌশিক

শিল্পী : সোমনাথ হোর

সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ

বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী

সত্যজিৎ রায়ের Filmography-র ওপর একঝলক দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে তার চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রচিত চারটি ছোটগল্প ও একটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে। ছোটগল্পগুলি হল 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা', 'সমাপ্তি' ও 'নষ্টনীড়' এবং উপন্যাসটি হল 'ঘরে-বাইরে'। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে Films Divison of India প্রযোজিত 'Rabindranath Tagore' তথ্যচিত্রটিও তিনি নির্মাণ করেন। সত্যজিৎ-এর সৃষ্টির জগতে প্রায় একইরকম স্থান পেয়েছে তাঁর অগ্রজ অনেক বিখ্যাত কথাসাহিত্যিকদের রচনা যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অশনি সংকেত'), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (জলসাঘর, অভিযান), তেমনই তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যিক যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (প্রতিদ্বন্দ্বী, অরণ্যের দিনরাত্রি), শংকর (সীমাবদ্ধ, জনঅরণ্য)। তাই শুধু সাহিত্যিসৃষ্টিকে চলচ্চিত্রে রূপদানের নিরিখে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথকে যে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন বা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন একথা বলা যায় না। কিন্তু সম্যকভাবে সত্যজিৎ রায়ের জীবন ও সৃষ্টির ওপর আলোকপাত করলে আমরা তাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের গভীরতা কিছুটা বুঝতে পারব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্কের প্রাথমিক সূত্রটা পারিবারিক। মৈমনসিংহের মসুয়া থেকে ১৮৭৯ সালে সত্যজিৎ-এর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী উচ্চশিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৪ সালে সাফল্যের সঙ্গে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিভিন্ন মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন ও একই সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৮৬ সনে এই সমাজের বিশিষ্ট সদস্য ও সমাজমসংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করেন ও একে একে এঁদের সন্তান সুখলতা, সুকমার, পুণ্যলতা, সুবিনয়, শান্তিলতা ও সুবিমল জন্মগ্রহণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্ম সমাজের স্রষ্টা ও সমাজপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সখ্য গড়ে ওঠে এবং দুই পরিবারের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কন্যাদের মতো উপেন্দ্রকিশোরও গানবাজনার চর্চায়, ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা ও পরিবেশন, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় রাখেন। এমনকি তিনি কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদও করেন। এই ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার ধারা দুই পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সার্থকভাবে প্রবাহিত হওয়ার ফলে উপেন্দ্রকিশোরের সন্তানসন্ততিরা বিশেষ করে সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। এখানে উল্লেখ্য যে ব্রাহ্মধর্ম এই দুই পরিবারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করলেও তা কখনওই উভয় পরিবারে মুক্তচিন্তা ও উদার সংস্কৃতিচর্চার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। এমনকি পারিবারিক ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের পরিবার যেমন গিরীন্দ্রনাথের বাড়ির দোল দুর্গোৎসবে সামিল হতেন, বা অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের রবিকাকার পরম স্নেহাস্পদ, তেমনই উপেন্দ্রকিশোরের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সারদারঞ্জন ও মুক্তরঞ্জন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলেও তাঁদের সঙ্গে অন্য ভাইদের পারিবারিক বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল। এ বিষয়ে সত্যজিৎ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন '...পুজোর ঘর থেকে শোনা যেত শাঁখ আর ঘণ্টার শব্দ, খুড়িমা-ঠাকুমারা প্রসাদ এনে খাওয়াতেন আমাদের। কিন্তু এই তফাৎ সত্ত্বেও ওদের পর-পর মনে হয়নি

কখনোও। সত্যি বলতে কি, এক ধর্মের ব্যাপারে ছাড়া ঠাকুরদাদাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মিল ছিল অনেক। হিন্দু সারদা, মুক্তিদা যেমন খেলাধূলা করতেন, মাছ ধরতেন, তেমনই করতেন ব্রাহ্ম কুলদা।' এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে দূর সরিয়ে আনন্দের প্রকরণগুলির সন্ধান ও চর্চা করার মধ্যেই যে জীবনে সার্থকতা, এই চেতনা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মতো গড়পারের রায় পরিবারের মধ্যেও প্রবাহিত ছিল। এই জীবনবোধই ছিল তাঁদের সৃষ্টিশীলতার চাবিকাঠি।

বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ও গড়পারের রায় পরিবার যে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তা কমবেশী সবারই জানা। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে এই দুই পরিবারের মিথষ্ক্রিয়া বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত জগৎকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। উপেন্দ্রকিশোরের রচনার উৎসাহদাতা ও সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বিষয়ে, পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী, তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' গ্রন্থে লিখেছেন "বাবার নতুন বই বেরোলেই আনন্দ প্রকাশ করে, আরোও লিখবার উৎসাহ দিয়ে তিনি চিঠি লিখতেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি দেশী গল্প শেষ হলে 'বিদেশী' গল্পের ভাণ্ডারে হাত দিতে তিনি বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন, কতগুলি বিদেশী বইয়ের নামও বলেছিলেন।" রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি পাঠও তা থেকে সাহিত্যিক উপাদান গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের মতোই উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ছেলেবেলায় ধনদাদুর থেকে শোনা মহাভারতের কাহিনী যে তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর স্মৃতিকথায় সত্যজিৎ উল্লেখ কচ্ছেন। ফেলুদার 'গোলকধাম রহস্য' কাহিনীতে মহাভারতের প্রসঙ্গ ও 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রে লক্ষণের শক্তিশেল নাটকের কিয়দংশ সংযোজনের মাধ্যমে তিনি এই দুই মহাকাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একই কথা প্রযোজ্য বিদেশী সাহিত্য পাঠ ও অনুবাদের মাধ্যমে তা রসগ্রহণ ও পরিবেশন করার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার দেশ-বিদেশের সাহিত্যের জগৎ শিশুকিশোরদের কাছে এতই সুখপাঠ্য করে তুলে ধরেন যে আজও তা পাঠকদের মুগ্ধ করে। সত্যজিৎ ছোট থেকেই বিদেশী সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন যা পরবর্তীকালে তাকে বিভিন্ন বিদেশী পরিচালকদের চলচ্চিত্র দেখা ও বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করে ও তার ঝরঝরে গদ্যে বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যরচনার ভিত্তি গড়ে দেয়।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গড়পারের রায় পরিবারের ওপর সাহিত্যের থেকেও বেশীমাত্রায় পড়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন সঙ্গীতের একজন সমঝদার ও স্রষ্টা এবং বেহালাবাদনে পারদর্শী শিল্পী। তিনি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেন ও দেশীবিদেশী স্বরলিপি রচনার একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত হন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ ছাড়াও তিনিই রবীন্দ্রনাথের গানে প্রথম 'স্টাফ নোটেশন' করেন যা ইংল্যান্ডে সঙ্গীত বিশারদ ফক্স স্ট্যাংগওয়েজ তাঁর বিখ্যাত 'দ্য মিউজিক অফ হিন্দুস্থান' গ্রন্থে ব্যবহার করেন। সুকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষ অনুরাগী। স্বভাবজাত কৌতুকপ্রিয়তায় তিনি অনেক রবীন্দ্রগানের প্যারোডি করেছিলেন, যেমন 'আমাদের শান্তিনিকেতন' এর কথা ও সুরে আদলে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর সৃষ্ট 'মন্ডা ক্লাবের' জাতীয় সঙ্গীত 'মন্ডা সম্মিলন'। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আদলে তিনি অনেক গভীর উপলব্ধির গানও রচনা করেন যার উদাহরণ— 'ছিল যে পরাণের অন্ধকারে' ও 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটির সুরের আদলে তিনি রচনা করেন যথাক্রমে: 'প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে' এবং 'নিখিলের আনন্দস্নান।' বাবা ও ঠাকুরদার সঙ্গীত চর্চার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে না পেলেও সুরের এই উত্তরাধিকার সত্যজিৎ-এর মধ্যে যথানিয়মে বর্তে ছিল। পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ থেকে তিনি বিখ্যাত সুরকারদের সুরসৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীকালে

এই সুরের আবেদন ও Symphonisation, Orchestration প্রভৃতি সাঙ্গীতিক ধারণা নিজের চলচ্চিত্রে সঙ্গীত রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজে লাগান। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগৎ সম্বন্ধে, তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগের কেন্দ্রে রয়েছেন তাঁর মা সুপ্রভা রায়, যিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রিয় পাত্রীটির সঙ্গে স্নেহস্পদ সুকুমারের বিয়েতে নিজে উপস্থিত ছিলেন।

সত্যজিৎ-এর ছোট মাসি কনক দাশও ছিলেন এক অসামান্য সঙ্গীত শিল্পী। এঁদের সাহচর্যে ছোট বয়সেই রবীন্দ্রনাথের গানের বিশুদ্ধধারার সঙ্গে সত্যজিৎ-এর পরিচয় ঘটে। যা তাকে এই গানের গভীর মর্ম উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। এর সার্থক প্রয়োগ তিনি করেছেন তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে। কিশোরকুমারের কণ্ঠে 'চারুলতা' চলচ্চিত্রে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'র রোম্যান্টিকতা, কাঞ্চনজঙ্ঘা চলচ্চিত্রে 'এ পরবাসে রবে কে'-র গভীর করুণ আর্তি, জনঅরণ্য চলচ্চিত্রে আবহে বাজাতে থাকা 'ছায়া ঘনাইছে বলে বনে'-র যে বেদনাময় অনুষঙ্গ তা এই গানগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত দৃশ্যগুলিকে অপরূপ ব্যঞ্জনাময় ও অর্থবহ করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ নয়টি রবীন্দ্রসঙ্গীত (কিছু আংশিক) ব্যবহার করেছেন। এই স্বল্পসংখ্যক গানে তিনি শুধু যে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের বৈচিত্র্য ও বাণীর গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন তাই নয়, স্রষ্টার মানবতাবাদ ও প্রকৃতিপ্রেমিক সত্ত্বাকেও দর্শকদের কাছে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার সূত্রে এবং 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাবনার কথা' নামে একটি লেখায় 'রবীন্দ্রসংগীত' সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়-এর প্রগাঢ় অনুভব ও ভাবনা-চিন্তার পরিচয় মেলে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে গড়পারের রায় পরিবারের ঐতিহ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের থেকে কিছুটা প্রাচীন এবং স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ এবং দুই ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী হিসাবে খ্যাত হওয়ার অনেক আগে থেকেই উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার তাঁদের চিত্রাঙ্কন প্রতিভার পরিচয় দেন। সুখেন বিশ্বাসের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে 'রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন'। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার তাঁদের লেখা কাহিনী ও পদ্যগুলিকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াসে রেখাচিত্র, প্রচ্ছদ-চিত্রণ, ও শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ছিলেন মূলতঃ চিত্রকর (painter) কিন্তু এক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমারের অঙ্কনচর্চার মিল ছিল। দুজনেই ছবি আঁকতেন প্রাণের টানে। শৈশবে পিতৃহারা সত্যজিৎ তাঁর স্মৃতিকথায় পিতার একটিই মাত্র স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। 'গঙ্গার ওপর সোদপুরের বাড়ীর উঠোনটা মনে আছে। একদিন বাবা ছবি আঁকছেন ঘরে জানলার ধারে বসে।' চিত্রশিল্পের প্রতি এই অন্তরের টান সত্যজিৎ ছোট থেকেই অনুভব করতেন, যা পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হল শান্তিনিকেতনে চারুশিল্পের পাঠ নিতে এসে। সেখানেই তাঁর প্রথম পরিচয় হয় পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে, আর গুরু হিসেবে পান নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রথিতযশা শিল্পীদের। এখানে তিনি শিখলেন রেখা ও রঙের বিবিধ ব্যবহার, পরিচিত হলেন চিত্রশল্পের নানা আঙ্গিকের সঙ্গে। তাঁর প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ এই আঁকারই সূত্রে, কীমার ও কীমার কোম্পানীর আর্ট ভিসুয়ালাইজার পদে। পরে বাণিজ্যিক শিল্পী হিসাবে যোগ দেন সিগনেট প্রেসে। বিশিষ্ট শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ অন্নদা মুন্সী ছিলেন এইক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মী ও পথপ্রদর্শক। এই পর্বে সত্যজিৎ সৃষ্টি করেন অপূর্ব সব পুস্তক-এর প্রচ্ছদ অলঙ্করণ এবং বিজ্ঞাপনী চিত্র। সত্যজিতের এই শিল্প প্রতিভা ও চারুবিদ্যা বিশেষকাজে লেগেছিল পরবর্তীকালে তাঁর চলচ্চিত্রের প্রচারপত্র পটভূমি ও বেশভুষার নক্সা প্রস্তুতিতে। সন্দেশ পত্রিকা ও নিজস্ব কাহিনীগুলির চিত্রণে তাঁর সৃষ্ট রেখাচিত্রগুলি আজও পাঠকদের মুগ্ধ আকর্ষণের বিষয়।

শিল্প সাহিত্যচর্চার বিষয়গুলি ব্যাতিরেকে রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুকুমার রায় ও পুত্র সত্যজিৎ-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সমাজচেতনা তাঁর 'জাতীয়তাবাদ' ও 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও তিনি কখনওই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তেমনই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও গড়পারের রায় পরিবারের সদস্যদের সমাজচিন্তা ও রাজনৈতিক চেতনায় কোনো অভাব ছিল না। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ না পেলেও সত্যজিৎ-এর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তাঁর সময়ের নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর কলকাতা ট্রিলজির সিনেমাগুলিতে (প্রতিবন্ধী, সীমাবদ্ধ, জন-অরণ্য) উদ্বাস্তু ও বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও সংবেদনশীলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'নায়ক' সিনেমাতে উঠতি নায়ক অরিন্দম মুখার্জীর দুঃস্থ কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার ক্ষেত্রে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তা মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাজিক অবস্থানগত মানসিকতার এক অনবদ্য প্রতিচ্ছবি। শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মানসিকতা ও সঙ্কট সত্যজিৎ-এর এক প্রিয় বিষয় যা তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে যেমন গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা, আগন্তুক প্রভৃতি।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে উৎসাহ উদ্দীপনা তা' সত্যজিৎ-এর পরিবারেও প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য 'বালকদের মনে স্ফূর্তি সঞ্চার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নৈপুণ্য সাধনে' সীমিত থাকলেও উপেন্দ্রকিশোরের ভাই ও ভাগিনেয়রা সাবেক কলকাতার ক্রীড়া জগতে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায়। এ বিষয়ে সত্যজিৎ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'ক্রিকেট শুরু করেন সারদা তারপর সেটা রায় পরিবারে হিন্দু ব্রাহ্ম সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।' শান্তিনিকেতনের যুযুৎসু শিক্ষক তাকাসাকি পরবর্তীকালে কলকাতায় চলে এলে সত্যজিৎ ও তাঁর ছোটকাকা সুবিমল রায় তাঁর কাছে জুডোর পাঠ নিতে যেতেন। এর সরস বিবরণ তাঁর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। সেই সূত্রেই হয়ত তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা মার্শাল আর্টে পারদর্শী হয়ে বোম্বাইয়ের বোম্বেটে দমন করে।

এই নিবন্ধ যেখানে থেকে শুরু হয়েছিল, এবার সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের যে গল্প-উপন্যাসগুলি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে প্রথমেই যে বিষয়টি নজরে আসে তা হল সংখ্যায় স্বল্প হলেও উক্ত সিনোগুলি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যচেতনা ও সৃষ্টির প্রতিনিধি স্থানীয়। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর স্থান-কাল-পাত্র অধিকাংশই বাংলার পল্লিপ্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা সমসাময়িক স্বচ্ছল পরিবারের মানুষজন। গল্পের বিষয়ও এই সাধারণ মানুষগুলির নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, জন্ম ও মৃত্যু। চরিত্রদের আন্তঃসম্পর্ক ও তাঁদের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে মানবিক মূল্যবোধ ও জীবনের পরম সত্যগুলির প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে চিরকালীন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। আর সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের ভাষা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের এই সারমর্মকেই তুলে ধরেছেন। তিনকন্যা সিরিজের সিনেমাগুলিতে যে অন্তর্দৃষ্টি ও মরমি মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙলার পল্লীবালাদের চরিত্রগুলি এঁকেছেন, সত্যজিৎ তাকে ভাব ও ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের স্বজনহীন পল্লীবালিকা রতন ও চাকুরীসূত্রে গ্রামে আসা পোস্টমাস্টারের মধ্যে গড়ে ওঠা স্নেহ ও নির্ভরতার যে বন্ধন তা আকস্মিক ছিন্ন হওয়ায় রতনের যে গভীর মর্মবেদনা তা চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'মণিহারা' গল্পে অলঙ্কার অনুরক্ত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবুঝপ্রেমের করুণ ও ভয়ঙ্কর পরিণতির মাধ্যমে লেখক মানব মনের যে বিচিত্রগতি ও গল্পের কথকের রোমাঞ্চপ্রিয়তা প্রকাশ

করেছেন তা সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রায়নে এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। 'সমাপ্তি' গল্পে এক দুরন্ত পল্লী-বালার মনে বিবাহ ও তদ্‌পরবর্তী বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রেম ও নারীসত্তার ক্রম উন্মীলন সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রে অনবদ্য মাধুর্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'নষ্টনীড়' গল্পটি অবলম্বনে 'চারুলতা' চলচ্চিত্রটিকে অনেক বিশেষজ্ঞ সত্যজিৎ-এর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা দিয়ে থাকেন। গল্পে স্বচ্ছল সংসারের তরুণীবধূ চারুলতা স্বামী ভূপতির নিজবৃত্তিতে সদাব্যস্ততার কারণে নিজেকে সঙ্গীহীন ও অবহেলিত বোধ করতে থাকে। কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যযশঃ প্রার্থী দেবর অমলের মধ্যে সে তার মনের দোসর খুঁজে পায় এবং সর্বদা তাকে একান্ত নিজের করে পেতে চায়। কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে এই সম্পর্ক করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে অভিমানী ও আবেগপ্রবণ এই গৃহবধূটির মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা ও নিসঙ্গতা সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রে এতই নান্দনিক ও সংবেদনশীল রূপে প্রকাশিত হয়েছে যে তা বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের দর্শকদের হৃদয় আপ্লুত করেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের উগ্র জাতীয়তাবাদ বিরোধী মনোভাব ও মানবতাবাদকে জাতীয়তাবাদের ওপরে স্থান দেওয়ার বিষয়টি কাহিনীর চরিত্রদের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেভাবে ফুটে উঠেছে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের ভাষাতে সেটিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

নিতান্ত শৈশবে মায়ের হাত ধরে পিতৃহারা সত্যজিৎ প্রথমবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। সেবার তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি ছড়া লিখে দিয়েছিলেন যা আজ বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে বহুলচর্চিত ও জনপ্রিয়।

'বহু দিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।'

এই ছড়াটির আদর্শেই পরবর্তীকালে সত্যজিৎ-এর শিল্পীসত্তা রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই দেশের চির পরিচিত প্রকৃতির রূপের মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য নিহিত আছে, এই দেশের সাধারণ লোকের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যে যে নিখিলের মানবতার প্রকাশ, তা তাঁর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ-এর শিল্পভাবনার একাত্মতা ও সিদ্ধি।

জন্মশতবর্ষের আলোয় সোমনাথ হোর

প্রণব দত্ত

বিগত শতকের চল্লিশের দশকে নানা কারণেই বাঙালীর উজ্জ্বল মনীষার এক অন্যতর স্ফূরণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। 'এলিট' বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে এই পর্বে আর এক 'রেনেসাঁ'র অভ্যুদয় ঊনবিংশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণকে অন্যতর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছিল। রাজনীতির আঙিনায়, সমাজজীবনে যে তোলপাড় দেখা দিয়েছিল তাকে ঘিরে বেশকিছু প্রণিধানযোগ্য গবেষণা ও চর্চার কথাও আমরা মনে করতে পারি। 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব' নামে অমলেন্দু সেনগুপ্তের একটি অসাধারণ গ্রন্থ রয়েছে এবং নানাসূত্রে গোপাল হালদার প্রমুখ এই সময়পটটিকে ধরে রেখেছেন তাঁদের অসংখ্য মূল্যবান লেখায়। বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে যাদের দলিলমূল্য অসামান্য; আমরা তার বিস্তারিত পরিচয়ে যাব না কিন্তু সেই উত্তাল সময়টির অভিঘাতকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে এক শিল্পী-জীবনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবো যাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি পালিত হচ্ছে এই ২০২২ সালেই, সময়ের 'ক্ষত'-কে ধারণ করে যে যুগন্ধর শিল্পী কালচেতনার অক্ষয় ভাষ্য রচনা করে গেছেন তাঁর বিবিধ সৃজনে, জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে উৎসারিত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভাঙাগড়ায় যিনি ক্রমান্বয়ে রূপান্বিত করে তুলেছেন তাঁর ব্যাপ্ত সৃষ্টির ভুবনকে। বরেণ্য এই শিল্পী হলেন সোমনাথ হোর (১৯২১-২০০৬); জন্মশতবর্ষের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে দায়বদ্ধ এই শিল্পীর জীবন ও শিল্পকৃতিকে ছুঁয়ে দেখার ক্ষুদ্র প্রয়াস থেকেই এই লেখাটির অবতারণা।

(২)

'বিশ্ববীক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মননের সংযোগ বিংশ শতাব্দীর ঘটনা। এত বড় একটি বিবর্তনের মূলে ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ছিল বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ আর ছিলেন, কার্ল মার্কস। বাঙালীর বৌদ্ধিক স্তরেও বিবর্তনটি এভাবেই ঘটে।'
['মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারা: সুমিতা চক্রবর্তী]

গত শতকের তিরিশ এবং চল্লিশ দশকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে পাখির চোখে তাকালে একদিকে আমরা দেখি উগ্র সাম্রাজ্যবাদী লালসার নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ, 'ফ্যাসিজম'-এর অভ্যুদয় ও মানব সভ্যতাবিরোধী বর্বরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণযজ্ঞ এবং অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম, জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিখিল মানবমুক্তির প্রয়াসে সর্বপ্রকার শোষণমুক্তির লক্ষে দেশে দেশে সংগঠিত লড়াই-আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক হিটলারবাহিনীর পরাভবে মানবতা ও সভ্যতার শত্রুদের হাত থেকে পৃথিবীর রক্ষা পাওয়া, বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসনশৃঙ্খল মোচন করে শাসিতের মুক্তিলাভ সেই সঙ্গে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের ভরকেন্দ্র ইয়োরোপ থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর।

এই পটভূমিতে এদেশের মাটিতে একদিকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নানা ধারার সমন্বিত স্রোতের বেগবতী হয়ে ওঠার পাশাপাশি সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের দুর্বার প্রবাহ, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ অন্যদিকে শাসক ও প্রতিক্রিয়ার শক্তির মদতে দাঙ্গা, মন্বন্তর ইত্যাদির প্রকোপে জনগণের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অবশেষে

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ। দাঙ্গা ও দেশভাগের ক্ষতলাঞ্ছিত, সেই স্বাধীনতার স্বাদ মুক্তিসংগ্রামীদের লালিতস্বপ্নকে অনেকাংশে ম্লান করে দিল যেন! উত্তাল এই সময়কে ধারণ করেই বাংলার শিল্প-সাহিত্যে, মনন ও সৃজনে দেখা দিয়েছিল এক নতুন তরঙ্গাভিঘাত। শতবর্ষীয়ান সোমনাথ হোর সেই ধারারই প্রতিভূ, তাঁর সৃষ্টিসম্ভার সময়ের এই সমুদ্রকে মন্থন করেই উৎসারিত, দেশকালের কর্ষণজাত ফসল।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন—‘শিল্প হচ্ছে সত্যের আহ্বানে মানুষের সৃজনশীল আত্মার প্রত্যুত্তর’, যে-কোন সত্যসন্ধ, দায়বদ্ধ শিল্পীর মতই সোমনাথ হোর-ও তাঁর সৃজনী সাধনায় এই জীবন-জিজ্ঞাসারই উত্তর সন্ধান করে গেছেন নিবিড় আত্মস্থতায়।

(৩)

সোমনাথ হোর তাঁর আত্মকথনে জানাচ্ছেন—“১৯২১ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে আমার জন্ম। চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে। আমার প্রথম শিল্পকর্ম—একটি সী-প্লেন বলা চলে জলভাসি বায়ুযানের মডেল তৈরি করা। ১৯২৭-২৮ সাল হবে। তখন আমি বাবার সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরে থাকি। একদিন খবর এল চট্টগ্রাম জেটিতে একটি হাওয়াই জাহাজ এসেছে, দলে দলে লোক দেখতে যাচ্ছে। সাম্পানে করে দূর থেকে বাবার সঙ্গে গিয়ে সেটি দেখে এলাম। তারপর দিনকয় ধরে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে ছুরি কাঁচি সুতো, কার্ড বোর্ড কঞ্চি আঠা ইত্যাদি নিয়ে ফড়িংয়ের মত দেখতে একখানি জলভাসি উড়োজাহাজ তৈরি করে ফেললাম লম্বায় ১৭/১৮ ইঞ্চির মতো। কার্ডবোর্ড তো আর জলে ভাসানো যাবে না, তাই সুতো বেঁধে জানলার পাশে ঝুলিয়ে দিলাম। হাওয়ায় নড়ে, কিন্তু কেউ তারিফ করে না। পড়াশুনা বিশেষ করতাম না। এসব করতে ভাল লাগত। কিছুদিনের মধ্যে বাবা আমাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন; একান্নবর্তী বিরাট পরিবার। সবাইয়ের সঙ্গে মানুষ (!) হোক, এই ছিল বোধহয় কামনা।

গ্রামে এসে নিম্নতম অর্থাৎ প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। ...কী করে নীচের ক্লাসের ঘাটসিঁড়ি কিছু কিছু অতিক্রম করলাম তা খুব একটা মনে পড়ে না। দেবেন্দ্র মজুমদার আমাদের ড্রইং এবং ড্রিল শেখাতেন, তাঁর ড্রইং ক্লাসে আমি খুব মন দিয়ে কাজ করতাম, কাজ মানে বাজারি কপিবুক থেকে চেয়ার টেবিল, বাড়ির গেট, গোলাপ ফুল প্রভৃতি। এগুলি করতে গিয়ে সোজা করে লাইন টানা, বেঁকিয়ে টানা, গোলবৃত্ত আঁকা ইত্যাদিতে আমি মজা পেতাম। মাস্টারমশায় আমাকে আঁকায় খুব উৎসাহ দিতেন। আমার আঁকার হাত দেখে আমার শৈলেনকাকা আমাকে জলরঙের ছোট একটি বাক্স কিনে দেন। ক্যালেন্ডার দেখে কিংবা বই থেকে রঙিন ছবি, ফুল, পাখি (মাছরাঙা খুব সুন্দর লাগত), আঙুরের থোকা বা আপেল নকল করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, খুব ভাবনাও হত, রঙ বুঝি ফুরিয়ে যাবে। চিত্তরঞ্জন দাশের ‘সাগরসংগীত’ কাব্যগ্রন্থে একটি ছবি দিল, তাতে জলের ওপর মেঘের আনাগোনার অন্তরালে চাঁদ, জলেও তার প্রতিবিম্ব, সেই ছবি নকল করতে গিয়ে কী যে হয়রানি; তবু দিনের পর দিন অপটু হাতে চেষ্টা করে গেছি।

তখনকার দিনে বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসীতে ছাপা ছবি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতাম। কী করে শিল্পীরা এসব আঁকেন? আমাদের গ্রামে এক কালীসাধকের আখড়ায় দুজন গ্রাম্য শিল্পী ‘শ্মশানে হরিশচন্দ্র’র কাহিনীচিত্র তিন দেয়ালে দিশি রঙ দিয়ে আঁকেন। আমি প্রায় গিয়ে দেখতাম। ভেবেই পেতাম না—কোন অলৌকিক শক্তি ও মন থেকে গাছপালা নদনদী জল আগুন পশুপাখি এবং সর্বোপরি মানুষ মানুষীর অবয়ব আঁকা সম্ভব। দেখে দেখে নকল করা যায়; কিন্তু মন থেকে আঁকা, সে কোন্ যাদু।” [আমার চিত্রভাবনা: সোমনাথ হোর]

এই স্মৃতিচারণা থেকেই আমরা জানতে পারি ছবি আঁকার জগতে তাঁর হাতেখড়ির কথা। জানতে পারি, যন্ত্রণাদীর্ণ সময়ের ক্ষত সময় থেকে সময়ান্তরে কীভাবে উৎকীর্ণ হয়ে যায় তাঁর শিল্পধ্যানে। তাঁর নিজের ভাষায়—**"পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে ক্ষত, যুদ্ধের যে অমানবিকতা, ছেচল্লিশের দাঙ্গার বীভৎসতা এগুলি আমার আঁকার পদ্ধতিতে খোদিত হয়ে যাচ্ছিল, আমারই অজানিতে। কাঠ খোদাইয়ের নরুন দিয়ে কাঠ কাটি, ধাতুতলে অ্যাসিড দিয়ে ক্ষত তৈরি করি, আগে থেকে কোনো খসড়া ছাড়াই এই কাটাকুটির কাজ চলে, পরে অসংখ্য ক্ষত একটি মাত্র বিষয়ের ইঙ্গিত বয়ে আনে; তা হলো আমাদের চারপাশের যারা অসহায়, পরিত্যক্ত, নিরন্ন, তাদের অবয়ব। দুর্ভিক্ষের ছবি দিয়ে যে খড়ি হাতের আঙুল পেরিয়ে হৃদয়ে দাগ কেটেছিল, তার দাগ আর মিলাল না।"**

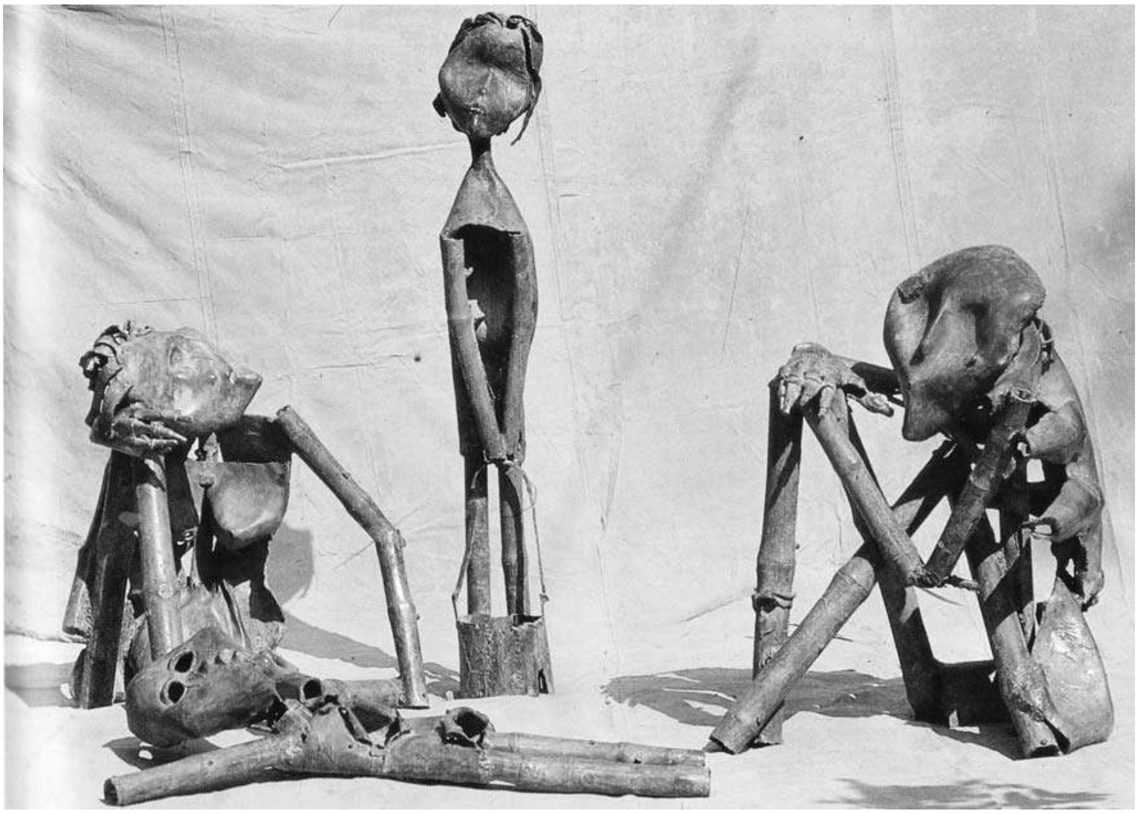

(৪)

সময় এগিয়ে চলে, সোমনাথ হোরের জীবন প্রবাহিত হতে থাকে নানা খাতে। ১৯৩৪ সালে পিতা রেবতীমোহনের অকালপ্রয়াণ, সোমনাথের বয়স তখন মাত্র তেরো। পাঁচ সন্তান নিয়ে মা পড়লেন অকূল পাথারে। সংসারে তীব্র অনটন। সোমনাথের জবানিতেই উঠে আসে এই সময়কালের কথা, তাঁর মা সিন্ধুবালা দেবীর জীবনসংগ্রামের ইতিবৃত্ত। সোমনাথ হোরের বাবা রেবতীমোহনের মধ্যে প্রোথিত ছিল স্বদেশচেতনা, তাঁর মাও সেই সময় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন ছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মেও নানাভাবে সাহায্য করতেন।

তিনি লিখছেন: 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমাদের অনটন তীব্র। এর মধ্যেও মা, ভাই এমনকি সাত-আট বছরের ছোট বোনও সাম্যবাদী সংগঠনের কাজে নানাভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।" চরম আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও সোমনাথের পড়াশোনা চলতে থাকে, মালদহে এক পিসেমশাইয়ের বাড়িতে থেকে ১৯৩৮ সালে মালদহ জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরে ছোটোকাকার চট্টগ্রামের বাড়ি থেকে কলেজের পড়াশোনা চালিয়ে ১৯৪০ সালে আইএসসি পাশ করেন। এরপর কলকাতার সিটি কলেজে বিএসসি-তে ভর্তি হন। সেই সময়ে (১৯৪০-৪১) তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ছাত্র নিবাসে থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সোমনাথ কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে আসেন। তাঁর আত্মকথনে সোমনাথ এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করে লিখছেন: "এই সময়ে শিবু নামে এক সঙ্গীর প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসি। পার্টি বে-আইনি ছিল; তাই আকর্ষণও সহজ ছিল। সে-সময় কিছুদিন হাতে লেখা পোস্টার করি। হাতের অক্ষর পরিচ্ছন্ন ছিল বলে পোস্টারগুলির কদর হত। জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর যুদ্ধের ব্যাখ্যা পালটে গেল, 'এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এক পাইও নয়, এক ভাইও নয়' আওয়াজ কিছুদিনের মধ্যে 'এই জনযুদ্ধে প্রতিটি পাই প্রতিটি ভাই' লেখা শুরু হল। এসবের তাৎপর্য খুব একটা বুঝতাম না। প্রায় ছাপার মতো করে লিখতে পারতাম, বন্ধুরা খুশি হত। আমিও এক ধরনের তৃপ্তি পেতাম।"

অচিরেই যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে জাপানী বোমার হিড়িকে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। সোমনাথ চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। সেখানে তাঁর কয়েকজন পুরনো বন্ধু বিমল সেন, রাখাল দাস তখন কমিউনিস্ট সক্রিয় কর্মী। বন্ধুদের সংগ্রহ করে দেওয়া তুলি-কালি ইত্যাদির মাধ্যমে পোস্টার আঁকা শুরু করেন। সেসব পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিক 'পীপ্‌লস্ ওয়ার'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে চিত্তপ্রসাদ এবং আরো কারো কারো ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হত। সোমনাথ সেগুলি বড়ো করে আঁকতেন, বন্ধুরা সেগুলি সেঁটে দিতেন হাটের গাছে, নাটমন্দিরে।

যুদ্ধের পায়ে পায়ে ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন তীব্র আকার নিয়েছে বাংলার বুকে দেখা দিল এক মহামন্বন্তর যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে ইতিহাসে কলঙ্করেখায় চিহ্নিত হয়ে আছে। নিরন্ন, মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় মানুষের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে, গ্রাম থেকে শহরের পথে এগিয়ে চলে মৃত্যুর মিছিল। সোমনাথ হোর লিখছেন: "কিছুদিনের মধ্যেই তেতাল্লিশ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর এল। তখন কমিউনিস্ট চিত্রশিল্পী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল। উনি আমাকে রাস্তায় রাস্তায় হাসপাতালে সঙ্গে নিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে ছিলেন—কী করে ভুখা এবং অসুস্থদের ছবি আঁকতে হয়। আমি কাঁচা হাতে তাই করতে লাগলাম। পার্টি থেকে রঙতুলি কাগজ কিনে দেওয়া হল। আমি পোস্টারে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বন্ধুদের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে এক নতুন ধরনের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লাম। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি খুব উৎসাহ দিল। কিছু কিছু ছবি 'জনযুদ্ধ', 'পীপ্‌লস ওয়ার'-এ ছাপাও হল। গণনাট্য সংঘের গান, আমাদের পোস্টার এক নতুন হাওয়া তৈরি করল। আমরা লঙরখানা খুললাম। সরকারি সাহায্যের সঙ্গে আমাদের আন্দোলনপ্রসূত জনতার উদ্যোগ এবং প্রেরণা লঙরখানা চালিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করল। এসবের মধ্যে দিয়ে আমি চট্টগ্রাম শহরে পার্টির সদরদপ্তরে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করলাম। ছবি আঁকা, পোস্টার করায় আমার অসীম উৎসাহ। কিন্তু তখনও আমি মৌলিক রচনায় স্বচ্ছন্দ নই।"

সময়ের সরণী বেয়ে এগিয়ে চলতে চলতে এভাবেই সুচিহ্নিত হয়ে যায় তাঁর শিল্পীজীবনের পথরেখা। এই পর্বে তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এক ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যার কথা সোমনাথ হোর নিজেই লিখে গেছেন—'প্রাদেশিক কমিটি হঠাৎ বলে পাঠালেন—আমি যেন কলকাতায় থেকে কাজ করি। এবারের

কলকাতা আমাকে অন্য মায়ের সন্ধান দিল। পার্টি সম্পাদক পি সি জোশীর আগ্রহে নিখিল চক্রবর্তী এবং স্নেহাংশু আচার্য আমাকে সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে জয়নুল আবেদীনের শিষ্যত্ব পেলাম। সোভিয়েত সুহৃদসমিতিতে তখনকার দিনের খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি, সংস্কৃতি কর্মীদের কাছাকাছি এলাম। গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, নিরঞ্জন সেন এবং আরো অনেকের সঙ্গ পেলাম। সুকান্ত ভট্টাচার্য তখন আমার বিশেষ বন্ধু।" কমিউনিস্ট পার্টির 'রাজনৈতিক পরিবারে'র পরিমণ্ডলে জীবনমন্থনজাত উপলব্ধিতে জারিত হয়েছিল তাঁর শিল্পী-মানস। জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান চারটি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রবাদপ্রতিম নেতৃত্ব মুজফ্ফর আহমেদ (কাকাবাবু)-এর 'আশ্রয়ে' ৭৭নং ধর্মতলা স্ট্রীটের পার্টি কমিউনে।

সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্রাবস্থায় পার্টি কমিউনে থাকার সময় পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু কাজ প্রকাশিত হতে থাকে। এইসময় কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী ও নৃপেন চক্রবর্তীর অসীম আগ্রহে তরুণ সোমনাথ হোর উত্তরবঙ্গের রংপুরে যান 'তেভাগা' আন্দোলন প্রত্যক্ষ করতে। বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে 'তেভাগা'-র বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এক উজ্জ্বল অধ্যায়। 'তেভাগা' কথাটির উৎস আধিয়ার আন্দোলন থেকে। জোতদারি ব্যবস্থায় যে কৃষক প্রধানত ভূমিহীন, জোতদারের জমি ভাগে চাষ করে সে অর্ধেক ফসলের অধিকারী। কিন্তু আসলে ঋণ, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকরা পুরোপুরি বঞ্চিত হয়, শেষপর্যন্ত অনাহারে দিন কাটায়। কৃষকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে একদিন তারা উপলব্ধি করে যে ফসলের ওপর তার অধিকার আরও বেশি। তাই অর্ধেক নয়, দাবী উঠলো 'তে-ভাগা' অর্থাৎ তিনভাগের দু'ভাগ পাবে ভাগচাষি বা 'আধিয়ার'রা আর জোতদার নেবে এক ভাগ। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ সালে দুই পর্যায়ে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের নানপ্রান্তে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহি, বগুড়া, ময়মনসিংহ সহ মালদা এবং ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাংলার ভাগচাষি বা 'আধিয়ার'-রা উৎপন্ন ফসলের তিন-চতুর্থাংশের দাবিতে গড়ে তুলেছিলেন তীব্র আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচিতি লাভ করেছিল 'তেভাগা আন্দোলন' রূপে।

১৯৪৬-এর ১৮ ডিসেম্বর থেকে ২৮শে ডিসেম্বর—এই দশদিন তেভাগা আন্দোলনস্পন্দিত রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় যান সোমনাথ, সেসব জায়গায় থাকা, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলা, বিশেষ করে কৃষকদের মাঠে নেমে লড়াই করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তিনি দিনলিপির আকারে ধরে রাখেন, সেইসঙ্গে বিভিন্ন মুহূর্তের কিছু রেখাচিত্রও আঁকেন। 'তেভাগার ডায়েরি' নামে সেই মর্মস্পর্শী চিত্র-আলেখ্য 'এক্ষণ' পত্রিকায় এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় যা এক অসামান্য 'আর্কাইভ' যার পাতায় পাতা ধরা রইলো এক সংগ্রামী, সংবেদী শিল্পীর গভীরতাময় পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি।

'তেভাগার ডায়েরি' লেখার পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি চট্টগ্রামের চা-বাগান অঞ্চলে যান সেখানকার বস্তিবাসী মানুষদের জীবনসংগ্রাম, মজদুর ইউনিয়নের সঙ্ঘবদ্ধ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। এই অভিজ্ঞতা ধরা

রয়েছে 'চা-বাগিচার কড়চা' নামে লেখা আর একখানি দিনলিপিতে। এই দুই বইয়ের বেশ কিছু রেখাঙ্কন পরে 'উডকাট'-এ রূপান্তরিত করেন, যার দুয়েকটি নমুনা এই লেখার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল।

'তেভাগার ডায়েরি'-র 'কৈফিয়ত' শীর্ষক মুখবন্ধে সোমনাথ হোর লিখছেন: "খরায় গ্রাম পোড়ে, বন্যায় গ্রাম ভাসে। শহরে আঁচ লাগে কিংবা ভিজে যায়। দুইয়ে তফাত অনেক. আমরা শহরের লোক, দীনদয়াল শকরুদ্দিনরা জীবনব্যাপী সংগ্রামে রক্ত ঢেলেছেন। আমরা আরাম কিনেছি। আশা করব তাঁরা নিজেরাই একদিন নিজেদের ইতিহাস লিখবেন; অন্যের প্রয়োজনে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবেন না।" সেদিনকার 'জাগ্রত কিষাণের চেহারা' দেখে তিনি লিখছেন: "নতুন সূর্যের লাল আভা তোমাদের চোখে মুখে। গাঢ় রক্তপ্রলেপ তোমাদের মাঠে মাঠে। বিন্দু বিন্দু লাল রক্ত দিয়ে যে বিরাট সোনালি ধানক্ষেত তোমরা বানিয়েচ, সে তোমরা ছাড়বে না—এ আমি জেনেচি, অনুভব করেচি। তোমাদের আবার জানাই অজস্র অভিনন্দন।" 'জীবনঘনিষ্ঠ' দায়বদ্ধ সংগ্রামী-শিল্পীর এই প্রত্যয়ী উচ্চারণ তেভাগা আন্দোলন-সংগ্রামের অন্তরস্পন্দটিকেই যেন ধ্বনিত করে তোলে।

(৫)

১৯৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯ এর উত্তাল দিনগুলির কথা স্মরণ করে পার্টিকর্মী সোমনাথ হোর লিখছেন—"রশীদ আলি দিন, দাঙ্গা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', ভিয়েতনাম দিবস—এগুলি আমাদের অস্থির করে তুলেছিল। উনপঞ্চাশের আত্মগোপন পর্বে অসংখ্য লিনোকাট, হাতে-আঁকা পোস্টার করছি. ছবির মতো ছবি হচ্ছেনা বলে গ্লানিবোধ করিনি; ক্লান্তিও আসেনি।" ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ হোরও গ্রেপ্তারবরণ করেন; জেলে থাকতে থাকতেই সরকারের কাছে আর্ট স্কুলের পরীক্ষায় বসার অনুমতি চান এবং খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই সেই অনুমতি পেয়েও যান। আর্ট স্কুলের সেই পরীক্ষায় সোমনাথ প্রথম স্থান অধিকার করে স্কলারশিপও পান।

১৯৫১ সাল-এ স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫২) প্রস্তুতি শুরু হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ তাঁকে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে পার্টির একটি প্রতীক সৃষ্টি করতে বলেন। সোমনাথ হোর আঁকেন কাস্তে আর ধানের শিষের নক্‌শা, যা পার্টির নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং পার্টিগত নানা ঘটনার আবর্তে আন্দোলিত হতে থাকে শিল্পী সোমনাথের জীবন। পঞ্চাশ সালের মাঝামাঝি তিনি পার্টি কমিউন ছেড়ে কলকাতার পাম অ্যাভিনিউর মুসলিম বস্তিতে মা-বোনকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন। ১৯৫১ সালে আর্থিক সংকটের জন্য জগবন্ধু ইনস:-এ ড্রইং শিক্ষকের কাজ করেন। এরপর ১৯৫৩ সালের জুন মাসে কলকাতা কর্পোরেশনের সহশিক্ষকের কাজে যুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও শিল্পচর্চার সহযোগী চিত্রশিল্পী রেবা দাশগুপ্তের সঙ্গে, তিনি ১৯৪৮ সালে আর্টিস্ট ফ্রন্টের এ্যাকটিভিস্ট হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বারশিপ পান। ১৯৫১ সালে রেবা দাশগুপ্ত (হোর) ডায়াসেশন স্কুলে আর্ট টিচারের কাজে যোগ দেন। এই শিল্পী-যুগলের 'পাঁচ সিকের বিবাহ'-তে অন্যতম সাক্ষী হিসেবে ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ এবং আরো দুই বন্ধু—সুবোধ রায় ও সুনীল কুন্দগ্রাম। রেবা হোর তাঁর স্মৃতিকথনে জানাচ্ছেন—'জীবন তখন তরতর করে কাটছিল। বক্তিজীবন সমষ্টিজীবন সবই টানাপোড়েনের মধ্যেও অন্যভাবে ধরা দিচ্ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রে স্কুলের কাজে যেমন আনন্দ পেতাম তেমনি ছবি আঁকায় নিজের একটা অন্যরকম পথ খোঁজার চেষ্টা আভাসে মনের মধ্যে ধরতে পারতাম। ১৯৫৪ সালে সোমনাথের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। পার্ক সার্কাসের ছোট্ট দু-কামরা বাসা (flat)-তে জীবন শুরু হল। তার মধ্যেই আমরা দুজনে মশগুল হয়ে কাজ করার চেষ্টা করতাম। আর্থিক অনটন কিছু ছিল। কিন্তু সেটা কোনোরকম বাধা ছিল না।'

এই বছরেই সোমনাথ হোর বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, অধ্যক্ষ অতুল বসুর আহ্বানে ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে গ্রাফিক বিভাগে কাজে যোগ দেন। এই সময়েই সোমনাথ-রেবা দুজনেই সক্রিয় রাজনীতির চেয়ে শিল্পচর্চায় বেশি করে মনোনিবেশ করতে থাকেন, ফলে পার্টির সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়। যদিও তা কোনো মতভেদ বা আদর্শগত কারণে নয়, শিল্পচর্চার প্রতি গভীর আত্মমগ্নতাই ছিল মূল কারণ। এই তাগিদেই তাঁরা সস্ত্রীক পার্টি সদস্যপদ পুর্ননবীকরণ না করার অভিপ্রায়ের কথা তাঁদের অভিভাবকতুল্য মুজফ্‌ফরআহ্‌মদকে জানালে তিনি সস্নেহ অনুমতি দেন। সোমনাথ এ প্রসঙ্গে লিখছেন—'১৯৫৬ সালে পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হলকিন্তু মানসিকতায় মার্কসবাদে বিশ্বাস অটুট রইল এবং কখনোই নিজেকে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিনি। সেই সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকেও ক্ষুণ্ণ হতে দিই নি।"

কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে প্রায় চার বছর শিক্ষক হিসেবে কাজ করার পর ১৯৫৮ সালে সোমনাথ হোর দিল্লী পলিটেকনিকে (যা পরে দিল্লী কলেজ অফ আর্ট-এ রূপান্তরিত হয়) আর্ট ডিপার্টমেন্টে গ্রাফিক বিভাগের প্রধান হিসাবে যুক্ত হন। প্রায় নয় বছর এখানে শিক্ষকতা করার সময় এখানে তিনি সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ করেন ভবেশ সান্যাল, শৈলজ মুখার্জী, দিনকর কৌশিক, ধনরাজ ভগত, বীরেন দে, জয়া আপ্পাস্বামীর মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের। সোমনাথ হোরের নিজের কথায় এই সময়পর্বের কথা ধরা রয়েছে এইভাবে: "দিল্লিতে প্রায় নয় বছর শিক্ষকতা করি। চিত্রকলার নান্দনিকতা বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তা নতুন রসদ সংগ্রহে ব্যাপ্ত হতে থাকে। এ সময়ে বিশদভাবে উপলব্ধি করি বিষয়কে শিল্পপ্রকরণের নানা আভরণে বিভূষিত করাই রসসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, বিষয়কে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সেটি সবসময় শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে হয় না, তার জন্য প্রয়োজন ধ্যানের।"

নবতর শিল্পসৃষ্টির নানা নিরীক্ষা চলতে থাকে, বিষয় ও প্রকরণে সূক্ষ্মতর অভিনিবেশের দাবী নিয়ে আবির্ভূত হয় তাঁর ড্রইং, কাঠখোদাই, এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি বহুতর মাধ্যমের কাজ। তবু দিল্লির কাজ হঠাৎই একদিন

ছেড়ে দিলেন তিনি, যদিও কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়তে চাননি। দিল্লি ছেড়ে তিন বছরের কন্যা চন্দনাকে নিয়ে সস্ত্রীক চলে এলেন কলকাতা, দুবছর অনিশ্চিত জীবন কাটানোর পর দিল্লিতে আর্ট কলেজের একদা সহকর্মী, অগ্রজপ্রতিম দিনকর কৌশিকের আহ্বানে ১৯৬৯ সালের শেষদিকে শান্তিনিকেতন আসেন, যোগ দেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের গ্রাফিক বিভাগে। এই শান্তিনিকেতনেই অতিবাহিত হয়েছিল সৃজনী প্রতিভার নব নব উদ্‌ভাসনে মণ্ডিত তাঁর জীবনের প্রায় চার-চারটি দশক। দুই মহান শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজের সাহচর্য ও উপদেশনা তাঁর রসোপলব্ধি ও সৃজনশীলতাকে আরও গভীরতার দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন:

"পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনে আসা আমার সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্করের শিল্পকলা আমি ছাত্রের মতো অনুধাবন করেছি। এদের ছবি কিংবা ভাস্কর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাক, সাহিত্য নেই, গল্প নেই। বিষয় থাকলেও বিষয়বস্তুর উৎপাত নেই, যা কিছু অনুরণন তা চোখের ধারায় হৃদয়ের দ্বারে। নির্বাক তবু কথা বলায়। দিল্লির দ্রুতলয়ের জীবনের বাহ্যিক প্রকাশ এখানে নেই। কিন্তু অঝোর রসধারা মনকে সিক্ত করে।"

অঝোর রসধারাসিক্ত সোমনাথ হোরের শিল্পীসত্তার বহুমুখী উৎসার রূপ পেতে থাকে কালিকলম, পাথরছাপ, ধাতুক্ষরণ ও ধাতুতক্ষণের বিবিধ শিল্পসৃষ্টিতে; আর শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি পরিবেশ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার অসংখ্য রেখাচিত্রে মূর্ত হয়ে থাকে সংবেদী এক শিল্পীর অনুভব ও রূপধ্যান।

শান্তিনিকেতনে যোগদানের পর ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে অসাধারণ সিদ্ধির অধিকারী সোমনাথ হোর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, কাঠখোদাই ও ধাতুশিল্পের কাজ করেছেন। স্কেচ, ছাপাই ছবির পাশাপাশি কলাভবনের স্টুডিয়োর দেয়াল জুড়ে সুবিশাল ম্যুরাল তৈরি করেছেন। এই সমস্ত শিল্পসৃষ্টির পাশাপাশি পরিণত বয়সে তিনি মগ্ন হন ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য গড়ায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় এই শান্তিনিকেতন পর্বেই শিল্পীর তৈরী অসাধারণ এক 'ব্রোঞ্জ' ভাস্কর্য 'ভিয়েতনামের ক্ষত' চুরির ঘটনা। তাঁর জবানিতেই আমরা পাই সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা। তিনি লিখছেন—"১৯৭৫ সালের মে মাসের গোড়ায় ভিয়েতনামের জয় ঘোষিত হল। দীর্ঘ ২৯ বছর এই অসম সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে দূরে থেকেও আমরা নানাভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সমগ্র এশিয়ার সংগ্রামী মানসিকতা প্রতিমুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকায় আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে অবিচল এবং অবিরাম ধিক্কার জানিয়েছেন। আমার ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক নূতন কল্পনা রূপ নিল। ব্রোঞ্জে তৈরি করলাম এক মাতৃমূর্তি—বিদীর্ণবক্ষে কমলবেষ্টিত উর্ধ্বমুখী

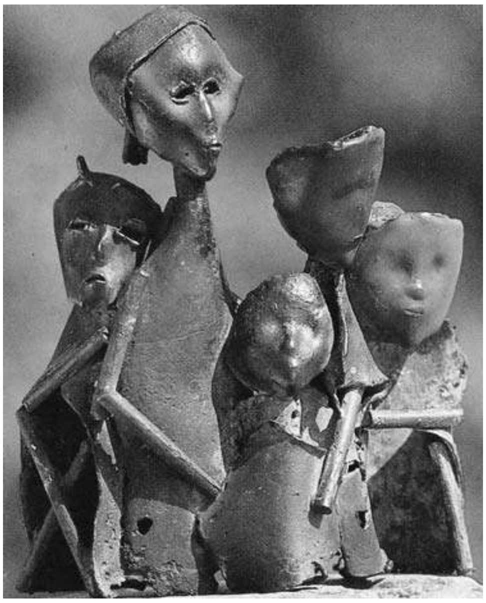

নবজাতক, যার বিভায় উদ্ভাসিত ভিয়েতনামী মাতৃত্ব। ছাপাচিত্রের নানাকাজের সঙ্গে প্রায় আড়াই বছর ধরে কাজ করে এই মূর্তি সেদিন শেষ হল, সেই দিনই (৩ নভেম্বর, ১৯৭৭) রাতের অন্ধকারে চিরকালের জন্য সেটি হারিয়ে গেল। চল্লিশ ইঞ্চি উঁচু, চল্লিশ কেজি ওজনের এই মূর্তি সরানো যথেষ্ট কঠিন কাজ ছিল। পরে বোঝা গেল, যাঁদের প্ররোচনায় এই কাজ সমাধা হল, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোয় সত্যিই শক্তিধর।”

সমাজজীবনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, চতুর্দিকের অর্থহীন হানাহানি, অরক্ষিত দুর্বলের প্রতি সমাজের উপর তলার আক্রমণ—এই সবরকমের অসহায়তাই যেন সোমনাথে শিল্পীর মনে দেখা দিয়েছে ক্ষতচিন্তার বিচিত্র বিস্তার হিসেবে। আর ক্ষতচিন্তার উৎস থেকেই তার চিত্রপটে ‘সাদার ওপর সাদার’ কাজগুলির জন্ম। কিছুটা বিমূর্তধর্মী ছবিগুলি রচিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে কোনও ‘ক্ষত’ যেভাবে সৃষ্টি হয় একেবারে সেভাবেই। এই প্রসঙ্গে সোমনাথ হোর লিখছেন—‘রাস্তায় চাকার গভীর দাগ, গাছে কুঠারের কোপ আর মানুষের দেহে অস্ত্রাঘাত সবই আমার চোখে ক্ষতরূপে দেখা দিল। এই ক্ষতচিন্তা থেকে আমার সাদার উপরে সাদা কাজগুলির জন্ম। এগুলির আপাত বিমূর্ত, কিন্তু এগুলি তৈরি হয়েছে প্রকৃত ক্ষত যেভাবে তৈরি হয় সেভাবে। মাটির পাত কিংবা মোমের পাতে নানা অস্ত্রের সাহায্যে, কখনও আগুনে ঝল্‌সে নিয়ে। পরে সিমেন্টের ছাঁচ তৈরি করে তা থেকে ছাপ নিয়েছি। সমগ্র প্রক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতির জন্য বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ আমার সামনে কোনো পূর্ব উদাহরণ ছিল না, ...প্রায় ১৩/১৪ বছর এই প্রথার বেশ কিছু কাজ করি। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতার কম্‌তির কারণে এই মাধ্যম ছেড়ে দিতে হয়। আগেই বলেছি এগুলির আপাত রূপ বিমূর্ত। এরই ফাঁকে ফাঁকে কাঠখোদাই, পাথরছাপ, ধাতুতক্ষণ এবং দেয়ালচিত্র করেছি—যার অধিকাংশই অবয়বী।”

(৬)

উন্মেষ-পর্ব থেকে শুরু করে জীবনের অন্ত্যপর্ব পর্যন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে শিল্পী সোমনাথের অভিযাত্রা। শিল্পী সোমনাথ হোর মনে করতেন—‘শিল্প সৃষ্টি এক সংগ্রাম।’ তাঁর এই সৃজন-সংগ্রামের অসংখ্য দিক্‌চিহ্ন আলোকিত করে রেখেছে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার দিগন্তকে। ‘পদ্মভূষণ’ সহ অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি, এদের মধ্যে রয়েছে—একাধিকবার ললিতকলা পুরস্কার, অবনীন্দ্র পুরস্কার, কালিদাস সম্মান, মুজ্‌ফফর আহ্‌মদ স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি।

শিল্পী ও প্রাবন্ধিক সুশোভন অধিকারী এই বরেণ্য শিল্পী সম্পর্কে 'আত্মবিদ্রোহী' শিরোনামাঙ্কিত একটি সন্দর্ভে লিখেছেন—"সোমনাথ হোরের কথা বলতে গিয়ে চকিতে মনে পড়ে যায় নন্দলালের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে নন্দলালকে বলেছিলেন 'আত্মবিদ্রোহী'। যে কিনা প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙে ফেলে নিজেকে নতুন করে গড়তে পারে। এই আত্মবিদ্রোহীরা বাজার আর জনপ্রিয়তার পিছুটান ছুঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেন না। নিজেরই ভাঁড়ার ক্রমাগত চুরি করে পসরা সাজিয়ে তুলতে এঁদের তীব্র অনীহা। সোমনাথ হোর এই দলের, যিনি জনতার হাততালির পরোয়া করেন না, আলগোছে চমক বা গিমিকের আশ্রয়ে তৈরি হওয়া কাজের বাজারকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে জানেন। আমৃত্যু গ্যালারিওয়ালাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সোমনাথ নিজের কাজকে আড়াল করতে চেয়েছেন।"

জীবনমন্থনজাত যে অমৃত উৎসারিত হয়েছিল মহান এই শিল্পীর বহুধাব্যাপ্ত সৃষ্টিতে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রেরণা নিহিত ছিল এক তিমিরবিনাশী প্রত্যয়ে—"প্রতীক্ষা দীর্ঘ হলেও শোষণমুক্ত সমাজ একদিন গড়ে উঠবে, এ বিশ্বাস এখনো রাখি। না না উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদকে এগোতে হবে। জীবনপ্রবাহ অবিরল এবং অবিরাম।"

জন্মশতবার্ষিকীর পাদপীঠে দাঁড়িয়ে মানুষের সৃজন-সংগ্রামের এই নিরন্তর অভিযাত্রার অগ্রপথিক সোমনাথ হোর-কে স্মরণ করার সূত্রে আমরাও প্রাণিত হতে থাকি—সমস্ত শোষিত, নিপীড়িত, আক্রান্ত মানুষের প্রতি সহমর্মিতাবোধে অকপট, মানবিক, উদার এক মহাযাত্রার মন্ত্রধ্বনিতে, যেমনটি সোমনাথ বিশ্বাস করতেন—"শিল্পী সহমর্মিতায়, ভালোবাসায়, প্রাণের বিকাশে সমস্ত হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে 'সমানে লড়ে যেতে পারে। কারণ সে সৃজনে বিশ্বাসী, ধ্বংসে নয়। মৃত্যুকে পেরিয়ে যাওয়ার চেতনাই তার প্রেরণা।"

তথ্যসূত্র

১. আমার চিত্রভাবনা—সোমনাথ হোর, সিগাল বুকস

২. মনে পড়ে, মনে পড়েনা—সোমনাথ হোর, দেবভাষা বই ও শিল্পের আবাস

৩. তেভাগার ডায়েরি ও চা-বাগিচার কড়চা—সোমনাথ হোর, সুবর্ণরেখা

৪. মুখোমুখি সোমনাথ হোর—সোমশঙ্কর রায়, বইপত্তর

৫. ক্ষতচিন্তা, ভাঙন—সোমনাথ হোর, দেবভাষা ও শিল্পের আবাস

৬. "আমি তোমাদেরই লোক" (সম্পা: শর্মিলা রায় পোমো), বীরুৎজাতীয় সম্মিলনী

৭. আমার কথা—কিছু মিছু: রেবা হোর, কারিগর

৮. 'জন্মশতবর্ষে সৃজন-সংগ্রামের অভিযাত্রী সোমনাথ হোর' : সন্দীপ দে (শারদীয়া 'দেশহিতৈষী', ১৪২৮)

৯. এখন শান্তিনিকেতন, বিশেষ সংখ্যা (কভার কাহিনী: সোমনাথ হোর), জুলাই ২০২২

১০. মাসিক কৃত্তিবাস, ডিসেম্বর ২০২১ সংখ্যা

With Best Compliments from :

MAHADEB RAUTH

Retired Revenue Officer
District PUrba Bardhman

E.BDN-1

Saheb Online Center

Xerox, Photo, Online from fillup, online Mutation, online, Parcha, searching are available here

Prof–Saheb Sk
Mob: 6296349697
Guskara, college more, Guskara
Purba Bardaman

E.BDN-4

With Best Compliments from :

Sona Construction

ITAHAR, UTTAR DINAJPUR
MOB: 9851080908

U.D-14

With Best Wishes :

PANKAJ SARKAR

BASIRHAT

N-24-72

With Best Wishes :

MRINAL DUTTA

BASIRHAT

N-24-73

With Best Wishes :

Sushanta Gayen

BASIRHAT

N-24-74

With Best Wishes :

LATE DHIENDERA NATH SARKAR

HASNABAD

N-24-75

With Best Wishes :

RAKHI SARKAR

BASIRHAT

N-24-76

With Best Wishes :

BAPI GANGULY

N-24-81

With Best Wishes :

AVIJIT DUTTA

N-24-80

With Best Wishes :

Prabir Nandi

N-24-82

With Best Compliments from :

আশু ভট্টাচার্য

শিমুরালী

নদীয়া

NDA-6

With Best Wishes :

বাসু ঘোষ

রসুল্লাপুর, চাকদহ

NDA-7

With Best Compliments from :

রাজেন বিশ্বাস

শিমুরালী

নদীয়া

NDA-8

Space Donated by :

SOHEL RAHAMAN

Mining Lessee

DIMDIMA, KHANVARTI, MURTI, PAGLI & SUKNA RIVER

MADARIHAT, ALIPURDUAR

ALP-7

With Best Compliments from :

ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রোগ্রেসিভ ‘ল’ ক্লার্কস
ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন
ভূমি ও ভূমি সংস্কার করণ
কুশমুণ্ডি
কুশমণ্ডি ব্লক ইউনিট, দক্ষিণ দিনাজপুর

DD-1

With Best Wishes :

MANIKUL ONLINE CENTER
Prop: Manikul Islam

Mob: 6295914271
P.O. + P.S. : Kushmandi
Dist: Dakshin Dinajpur
Pin : 733132

DD-2

With Best Compliments from :

Safik Online Center
Prop: Safik Jaman

Vill: Paschim Mollapara
P.O: Manikore, P.S: Kushmandi
Dist: Dskshin Dinajpur,
Pin: 733132, Mob: 7063562117

DD-10

With Best Wishes :

RESMA ONLINE CENTER
Prop: Arsed Ali

Vill : Ujil Dangapara
P.O: Araji Panishala, P.S: Kushmandi
Dist: Dakshin Dinajpur
Pin : 733132, Mob: 9064701386

DD-12

With Best Compliments from :

Rony and Land
PROP. ABHISHEK MONDAL
(REGS. LAW CLERK & DEED WRITER)
ADDRESS: NAUL, SHYAMPUR, HOWRAH
MOB: 8514954078

HAW-20

With Best Compliments from :

Maity Land Solutions
PRO. S. MAITY

Land Records & Registration Related Work Done here
SHYAMPUR, HOWRAH
MOB: 7872092797

HAW-22

With Best Compliments from :

Subrata Dhara
(CONSULTANT)
BL.&L.R.O. AMTA-I,
HOWRAH
PH: 7584952662

HAW-81

With Best Compliments from :

S.D. Group
জায়গা ক্রয় ও বিক্রয় করার একমাত্র
বিশ্বস্ত প্রতষ্ঠান
MOB : 9932759260/ 9733835299 / 964743600
মুড়মারী: পশ্চিম মেদিনীপুর

W.MID-31

With Best
Compliments from :

A WELL WISHER

PUR MDN-50

With Best
Compliments from :

Sairul MOndal

MSD-8

With Best
Compliments from :

SRI JOYDEEP ROY
&
REJWAN SK.

MSD-12

Best Compliments from

“ভূমি পুত্র’

এই স্থানে হাওড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের ও যে কোন মৌজার যাবতীয় জমি সংক্রান্ত বিষয়ের সমস্যার সমাধান করা হয়। এছাড়া দলিল রেজিস্ট্রিকরণ, বাড়ী তৈয়ারীর নক্সা অনুমোদন এবং ফ্ল্যাট, কারখানা, গোডাউন, দোকান ঘর, মিউটেশন, কনভারসান, হাল সার্চিং ও পর্চা করা হয়।

এবং যে কোন জমির ও বাড়ীর ক্রয়ের ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধান দেওয়া হয়।

সততাই আমাদের মূলধন।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

অফিস প্রযত্নে

অসীম কুমার ধর (Govt. Regd.) আন্দুল রোড

পাকুড়তলা বাসস্ট্যান্ড, দুইল্যা, সাঁকরাইল, হাওড়া

মো ঃ 7278331329 / 8017022388

বি.দ্র.: এখান অতি যত্ন সহকারে জেরক্স ও ল্যামিনেশন করা হয়।

HAW-1

Best

Compliments

from

Ganesh Chandra Sapui

SAKRAIL

HAW-2

With Best
Compliments from :

A WELL WISHER

HAW-3

Best
Compliments
from

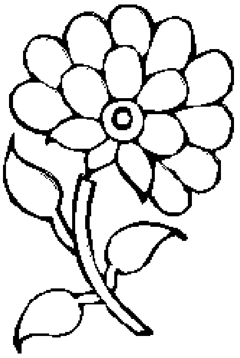

মণ্ডল পাওয়ারটিলার সার্ভিস সেন্টার

প্রো: অধীর মণ্ডল

ফোন: ৯৮৩৬২২৪৬২৬

এখানে চাষের জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি ভাড়া পাওয়া যায়

S-24 PGS-1

With Best Compliments from :

ABHISHEK PRAMANIK

Law Clerk
Kulpi B.L. & L.R.O. Office
Kulpi, South 24 Pgs
Ph : 9932874972
8918334363
West Bengal Law Clerks State Council

S-24 PGS-5

Best Compliments from

Md. Abdul Chiddique
M.A. Chiddique

N-24-5

With Best
Compliments from :

Well Wisher

N-24-6

With Best Compliments from :

SOUMEN ENTERPRISE

Building Developer

Sarajit Mondal

PROPRIETOR

MOB: 9830215950
SREE PALLY ROAD, NETAJI PALLY,
NOAPARA, BARASAT
KOLKATA-700125

N-24-7

With Best Compliments from :

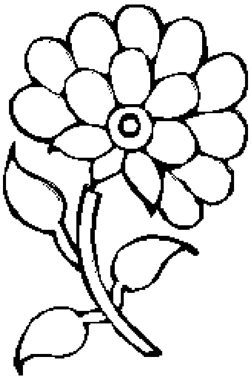

SUBASH LAHA

Paschim Burdwan

PAS BDN-13

সম্পাদক ঃ অম্লান দে

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯